ভূমিকা।

ছয়টি সাহিত্য-সন্দর্ভ সংযোগে "সাহিত্য-সাধনা" রচিত। প্রবন্ধ কয়টি ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নামে ও বিষয়ে পৃথক্ হইলেও প্রবন্ধগুলির মূল লক্ষ্য এক—মূলে একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি। সেই জন্য কোন কোন প্রবন্ধের দুই এক স্থলে দুই এক কথার পুনরাবৃত্তিও হইয়াছে। আবার, কিছুদিন পরে পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রবন্ধান্তরে নিজেই সেই মতের প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিয়াছি'—কথাটা হঠাৎ শুনিতে কেমন কেমন লাগে বটে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, এ কেমন কেমন না লাগিতেও পারে।—মত পরিবর্ত্তন হয় না কার? কাল-স্রোত অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে; জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহার অনুসরণ করিতেছে;—মত-পরিবর্ত্তনের অপরাধ কি? এ কথায় যাঁহার উপহাসের প্রবৃত্তি হয়, তিনি উপহাস করুন;—আসল কথাটা কিন্তু মোদ্দা এই। সেই জন্য প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে, সন তারিখ দিয়া লেখার কাল নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপরও যিনি, যে কোন 'বিশেষণে' বিভূষিত করিবেন, তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

কেন না, গ্রন্থ প্রকাশ হইলে, তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই থাকে। তবে যিনি, কৃপা-পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন,—এরূপ মত-পরিবর্ত্তনের মূল কারণ কোথায়? উপর উপর ভাসা ভাসা পাঠ করিলে তাহা না বুঝিবারই সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধগুলির বর্ত্তমান সংস্করণে, কোন কোন স্থল আমূল পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"মেঘদূতের" সমালোচনাটি আমার স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদর সুকবি শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর লিখিত। বিপিন-বিহারীর কবিত্ব ও সমালোচন-শক্তির পরিচয়, আর নূতন করিয়া দিবার আবশ্যক দেখি না। ইতিপূর্ব্বে "ফুলের গানে" বিপিনবিহারীর অনেক লেখা আমি সম্পাদন করিয়াছি;—তাহাতেই আমি আমার বক্তব্য, সমস্তই বলিয়াছি। সহৃদয় পাঠকও সেই গ্রন্থে বিপিনবিহারীর ... ও সামর্থ্যের সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন। ফলতঃ, এই মেঘদূতের সমালোচনাটিও বিপিনবিহারীর পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সমালোচনাটি সুকৌশলে, সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লিখিত। যাহাতে আপামর সাধারণের বোধগম্য হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, স্ত্রীপুরুষের কথোপকথনচ্ছলে, মূল গল্প প্রসঙ্গে, সমা-লোচনাটি লিখিত।

অনেকের ধারণা,—প্রবন্ধ ও সমালোচনা, কেহ বড় একটা পড়ে না। আমি এ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। আমার উপন্যাস-প্রিয় পাঠক পাঠিকা,—আমার এ সাহিত্য-সন্দর্ভ গুলিও পাঠ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। কেন না, আমার উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—যে আদর্শবাদ, এই সন্দর্ভগুলিরও মূল কথা তাই। তবে একটু আয়াসলব্ধ বটে। তা একবার একটু আয়াস স্বীকার করিতে আমি সকলকে অনুরোধ করি।

বিনীত

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাস।

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সাধনা।

ভিক্টোরিয়া-রাজত্বে

বাঙ্গলা সাহিত্য।
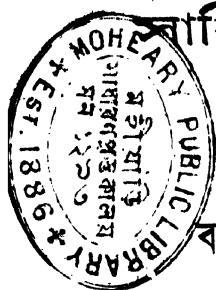
১

মা নাম কি মধুর! জননী-জঠর হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়া, প্রথম কান্নার স্বরে, অতি

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সম্মানার্থ, "সাহিত্য-সম্মিলনের" বিশেষ অধিবেশনে পঠিত;—উপস্থিত সংশোধিত।

অস্পষ্টভাবে প্রথম যে নাম উচ্চারণ করিয়াছি,—আর আজি এই সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে বিজড়িত জীবন-যৌবনে যে নামের ভেলা অবলম্বন করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পাইতেছি,—এবং ভবিষ্যতে কর্ম্মসূত্রে যে ভাবে, যেমন অবস্থায় যে নাম-মালা জপ করিতে করিতে ইহজীবনের অবসান হইবে,—সে সকলের মূলেই আমার মহামাতৃভাব বিরাজিত। এ মা, আমার গর্ভধারিণী জননীও বটেন, আর এ মা আমার শব্দরূপিণী, ভাবময়ী ভাষাও বটে। মাকে ভালবাসা এবং ভক্তি করা যেমন স্বাভাবিক, মাতৃভাব-জড়িত মাতৃভাষাকেও ভালবাসা ও ভক্তি করা তেমনই স্বাভাবিক। যে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, সেই স্থানে বুঝিতে হইবে যে, কোন-না-কোন বিষয়ে, কিছু-না-কিছু উলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

মাকে সেবা করিবার অধিকার সকলের

আছে; সেবা করেনও সকলে।—কেহ প্রত্যক্ষ-ভাবে মাতৃসেবা—মাতৃপূজা করেন; কেহ পরোক্ষে মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। আর যিনি, এ দু'য়ের কোন দিকেই নন, তিনি সহস্র গুণে গুণবান্ বা সৌভাগ্যবান্ হইলেও, কৃপার পাত্র।

যে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর পুণ্যস্মৃতি অবলম্বনে এই প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাঁহার সম-সময়ে, তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে, আমার এই মাতৃস্থানীয়া মাতৃভাষার মোহন বিকাশ। মাতৃস্তনদুগ্ধপানের সহিত আমরা যে নাম শুনিয়া আসিতেছি এবং আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পিতা ও পিতামহও যে পবিত্র নাম শুনিয়া আসিয়াছেন,—সেই মূর্ত্তিমতী করুণা—দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যপ্রভাব,—আমার ভাষার বর্ণে বর্ণে সুচিত্রিত হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে। আমার ভাষাও যেমন করুণাময়ী, আমার

ভাষার পালন-কর্ত্রী—জননী ভিক্টোরিয়াও তেমনি করুণাময়ী।—ভিক্টোরিয়া আমার ভাষার পালন-কর্ত্রী? হাঁ, সেই করুণাময়ী দেবীই আমার ভাষার পালনকর্ত্রী!—মনে পড়ে কি ভাই, সেই ১৮৫৭ সালের সেই ভারতব্যাপী সিপাহি-বিদ্রোহ? সেই বিদ্রোহ-বিপ্লবের অবসানেই না দয়াময়ী রাজরাজেশ্বরী মা আমার, প্রজার দুঃখে ব্যথিত-প্রাণ হইয়া, উদার উন্নত ভাবে, মুক্তকণ্ঠে এই অভয়বাণী ঘোষণা করেন,—"ভারত-প্রজার ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবিশ্বাসে, কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না"—তাই না আজ হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত—সমগ্র ভারত তাঁহার আত্মার সদ্গতিলাভের জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ? তাই না তিনি জীবনে মরণে, তুল্যরূপে ভারতবাসীর সভক্তি কৃতজ্ঞতার অশ্রু গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন? তাই না আরাধ্য ইষ্ট-দেবতার ন্যায় তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি, বুক চিরিয়া ভারতবাসীর

বুকে বসিয়াছে? আর তাই না ভারতের সকল জাতির সকল ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে? হিন্দী, নাগ্‌রী বা উর্দ্দু—এ সকলের কথা বলি না,—জানিও না,—আমি বাঙ্গালী,—আমার প্রকৃতিদত্ত মাতৃভাষা,—আমার দীন হীন মলিন বাঙ্গলা,—আজ কাহার কৃপা-কটাক্ষবলে, জগতের সভ্যজাতির গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে? কাহার অভয়বাণীর ফলে আমার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন ধর্ম্মভাব,—আজ আমার কাব্য-সাহিত্যে সমুদ্ভাসিত? কাহার শিক্ষা ও সমতা-বিস্তার গুণে আজ আমার জাতীয়তা, একতা ও সখ্য-সম্মিলনের শুভ সূচনা? কাহার মোহনমন্ত্রে আজ ভারতে কংগ্রেস, ধর্ম্মমহামণ্ডল, বিবিধ সভাসমিতি ও আবেদন-আন্দোলন? কাহার উদার উন্মুক্ত ধর্ম্ম-স্বাধীনতা-প্রচারে, বঙ্গ-কবির হৃদয়-বীণাঝঙ্কারে, 'ভারত-সঙ্গীত' 'যমুনা-লহরী' ও 'বন্দে মাতরং' গীতিতে দিক্‌সমূহ

মুখরিত? মুক্তকণ্ঠে বলিব,—এ সকলই আমার স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর সেই ৫৮ সালের অভয়-বাণীর ঘোষণাফল!

ধীরচিত্তে একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে যে, ভিক্টোরিয়ার এই অভয়বাণীর মূলে ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির বীজ নিহিত আছে। তৎপূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, ভারত-প্রজার ধর্ম্ম-স্বাধীনতার বিশেষ মূল্য ছিল না। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া হইয়া, পুনরায় যে, হৃদয়ের সাম্য-স্বাধীনতা ঘোষিত হইল,—তাহাই বিশেষ মূল্যবান্। উপরন্তু, যে ভারতে একদিন মুসলমান রাজা, এক হস্তে ইস্‌লামধর্ম্ম ও অন্যহস্তে তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন,—রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী ভিক্টোরিয়া, সেই ভারতে, প্রজার ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার দিলেন!—এ কি কম উদারতা ও মহত্ত্ব? আমাদের অদৃষ্ট-দোষে তাহার ফল যাহাই হউক্, ভিক্টোরিয়ার রাজনীতির

মূলমন্ত্র বড় গভীর ও পবিত্র। তাই, সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই জননীর সেই অভয়বাণীর ঘোষণার কথা মনে পড়ে। এই অভয়বাণী পাইয়াই, স্বভাবের নিয়মবশে, যেন আমার অর্দ্ধমৃতা ভাষা-জননী স্নিগ্ধ-বায়ুহিল্লোলে সজীব হইয়া, অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেবা ও পূজার জন্য,—তাঁহার পালন ও পুষ্টির নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তসন্তানগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জননী হাসিলেন, হাঁফ ছাড়িলেন,—যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সেই জন্যই স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যস্মৃতি,—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে চিরদিন সমুজ্জ্বল রহিবে। অন্যান্য বহু বিষয়ের সহিত সেই পবিত্র স্মৃতি চিরজড়িত আছে এবং চিরদিন থাকিবেও;—পরন্তু, বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত সেই স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত থাকিবার কারণ এই যে, বাঙ্গালী বড় কৃতজ্ঞ রাজভক্ত জাতি। তাই, স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী বৃটন-লক্ষ্মীর

নিকট হিন্দুসন্তান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে উপকার পাইয়াছে,—সে উপকার, সে আজীবন মনে রাখিবে, এবং তাহার আত্ম-প্রতিবিম্ব তুল্য কাব্যে ও সাহিত্যে, তাহা চিরকাল দেদীপ্যমান্ থাকিবে।

ফলতঃ মাতা, মাতৃভাষা ও ভিক্টোরিয়া,—এ তিনই আমাদের চক্ষে এক।

২

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পূর্ব্বে, অর্থাৎ আজ একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা, যেন আমাদের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যের সেই সূক্ষ্ম ইতিবৃত্তের সম্যক্ আলোচনা, আমি উপস্থিত প্রবন্ধে করি নাই। সেই আলোচনা ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ করিয়াছেন। পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, তাঁহার "সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে

কিছু কিছু বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, তাঁহার "Modern Literature of Bengal" নামক গ্রন্থেও এ বিষয়ের অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকারও তৎ-প্রণীত "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে, 'সাহিত্য-সন্ধান' নামক প্রস্তাবে, তৎকালীন ভাষার একটু আধটু নমুনাও দিয়াছেন। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও এ সম্বন্ধে অনেক দিন ধরিয়া অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও যথাক্রমে "বিশ্বকোষ" অভিধানে এবং "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় মনোযোগী হইয়াছেন। সেই সকল ভাষা ও লেখার নমুনা দেখিলে মনে হয়,—ভাগ্যবতী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, ইংলণ্ডের সর্ব্ববিধ বিজয়-শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষাও সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ,—

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার। তাহার ফলে বঙ্গ-সন্তান আপন জাতীয় অভাব উপলব্ধি করিয়া, জাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে কারী, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি পাদরীসাহেব এবং কোন কোন সদাশয় সিভিলিয়ান্‌ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় বাইবেল প্রচারই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি, তৎসঙ্গেও যে, তাঁহারা বাঙ্গলা, উড়িয়া, দেবনাগরী প্রভৃতি ভাষায় পাঠ্য-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য অবশ্যই তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীরামপুরে তাঁহারা প্রথম বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন।* সেইখান হইতে প্রথম বাঙ্গলা গ্রন্থ ছাপা হয়। কৃত্তিবাসী

---

* এ সম্বন্ধে একটু মত-পার্থক্য আছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের "প্রচার" নামে খৃষ্টীয় মাসিক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সার চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ স্বহস্তে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা হরফ প্রস্তুত করেন। মিঃ হলহেড্ সাহেব

রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতও সেই ছাপা-খানা হইতে ছাপা হইয়াছিল। পাদরী সাহেব-দের বাঙ্গলার একটু সামান্য পরিচয় লউন ;—

"এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল। আর জলে একজাই খাপরা-বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গেদের বড় দুঃখ হইল। শেষে সকল হইতে সাহসী এক বেঙ্গ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা! তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর স্বভাব শিক্ষহ।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেও অনেক-গুলি বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানেও কারী সাহেব বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে মিশাইয়া এক ব্যাকরণ ও এক অভিধান প্রস্তুত করেন।

সর্ব্বপ্রথমে "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন। সেই ব্যাকরণ খানিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা পুস্তক। তৎপরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীগণ বাইবেল মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাম-পুরে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।"—প্রচার, ফেব্রুয়ারী, ১৯০১।

এই সময় রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে 'তোতাপাখীর ইতিহাস' নামে এক গ্রন্থ উর্দ্দু হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা কে, তাহার স্থিরতা নাই। এই গ্রন্থের ভাষার একটু নমুনা দেখুন ;—

"পূর্ব্বকালে ধনবানদের মধ্যে আদমসুলতান নামে একজন ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য সামন্ত ছিল।"—ইত্যাদি।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর "লিপিমালা" এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "রাজাবলী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লিপিমালার নমুনা,—

"তোমাদের মঙ্গল সমাচার অনেক দিবস পাই নাই। তাহাতেই ভাবিত আছি; সমাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত, গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।"

"রাজাবলীর" নমুনা ;—

"শকাদি পাহাড়ী রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে মারিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট হইলেন।"—ইত্যাদি।

এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। "বত্রিশ সিংহাসনের" ভাষার একটু নমুনা দেখুন ;—

"এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভা মধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন, যে লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণকালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না, ইহারও সেই মত দেখিতেছি, অতএব বুঝিলাম, ইনি যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না।"

ইহার অব্যবহিত পরে, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম এক জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী তিনি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। এইরূপ, স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয়ও, বাঙ্গালীর মধ্যে, সর্ব্বপ্রথমে, ইংরেজী ও বাঙ্গলা-ভাষা মিলাইয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। তাঁহার অভিধান, এতদ্দেশীয় ইংরেজী পাঠার্থীর প্রথম অভিধান ছিল।

এইরূপে রামজয় তর্কালঙ্কারের "সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ," লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার-প্রণীত "মিতাক্ষরা দর্পণ", কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের "ন্যায়-দর্শন" এবং পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার "পুরুষ পরীক্ষা" "হিতোপদেশ" প্রভৃতি গ্রন্থ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য ছিল। "পুরুষ পরীক্ষা"র ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল বটে। একটু নমুনা দেখুন ;—

"বঞ্চক কহিতেছে, ভো রাজকুমার, আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক ; তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকা-রোহণ করিয়া সাগর পারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূলধন হইতে এক শত গুণ লাভ পাইয়া

তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকট আমার বৃহৎ-তরণী মগ্ন হইল, তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সে যাহা হউক আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তুমি আমার প্রাণদণ্ড কর।”

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গদ্য সাহিত্যের এই নমুনা। ইহাকে দুই স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তর—মিশনরী বাঙ্গলা; দ্বিতীয় স্তর—পণ্ডিতী বাঙ্গলা। অবশ্য বাঙ্গলা পদ্য, সে সময়, এই গদ্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট ছিল।

এক হিসাবে খাঁটী বাঙ্গলা পদ্যের এখন যেন কিছু অবনতি হইয়াছে। ইংরেজীর অত্যধিক অনুকরণ-স্পৃহা ও কষ্ট-কল্পনাই, বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ। পয়ার-প্লাবিত বাঙ্গলা দেশে সেই স্বভাব-কবি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ঘনরাম, ভারত-চন্দ্র, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবিতা—এখন একান্তই দুর্লভ। অধিক কি, প্রখ্যাতনামা ‘গুপ্তকবি’

ঈশ্বরচন্দ্রের সেই সহজ সরল রসাল রচনাও, এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গলা-কবিতা লিখিবার জন্য, স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হয় না। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী এই সব মহাকবিদের কথাও ছাড়িয়া দিই,—গীতি-কাব্যকার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, এবং জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস—যে দেশের আদি বৈষ্ণবকবি; শ্রীজয়দেব যে দেশে ললিত মধুর ঝঙ্কারে 'ললিত লবঙ্গলতা' গান গাহিয়াছেন; ভক্তপ্রবর রাম-প্রসাদ এবং সাধক কমলাকান্ত যে দেশে 'মা' নাম গাহিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন;—অধিক কি, সামান্য পাঁচালী-গায়ক দাশরথি রায়ও যে দেশে, সাদা কথায় অতি সোজা ভাষায় ভাবের লহরী ছুটাইয়া-ছেন,—সে দেশের লোকের কবিতা বা গান রচনার জন্য বিদেশীয় সাহিত্যের আদর্শগ্রহণ

আবশ্যক হয় না। অপিচ, সেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের একমাত্র আদর্শগ্রহণেই, যেন আমাদের খাঁটী বাঙ্গলা কবিতা, এক সোপান নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছে।

তবে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য, বাঙ্গলা গদ্যের আদর্শ,—এখন বহু ইংরেজী সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সাহিত্যের বিশালতা ও উদারতা হিসাবে,—হিন্দুর আদর্শমূলক সাহিত্য-গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত যথেষ্ট বটে; কিন্তু বিষয়বৈচিত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ও বিভিন্ন স্বাধীন মৌলিকচিন্তা সংগ্রহ করিতে, ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ সাহায্য আবশ্যক হইবে। সে হিসাবে, আরও অন্ততঃ শতবর্ষকাল, এই ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গতি চলিলে, সে আশা অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, সংক্ষেপে

আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু বলি নাই যে, আর এক মহাত্মা সে সময় নানা কার্য্যে অশ্রান্ত শ্রম করিয়াও বাঙ্গালীকে বাঙ্গলা পাঠ করাইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মত-পার্থক্য থাকিলেও এ কথা অম্লান বদনে বলিব, তৎকালীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইনিও একজন পরিচালক। রাজা রামমোহন রায়কে আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। উক্ত মহাত্মার "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী," "বেদান্তের অনুবাদ," কঠোপনিষদ," 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি গ্রন্থ,—সে সময়ে প্রধান বাঙ্গলা গ্রন্থ ছিল। রাম-মোহনের ভাষার নমুনা দেখুন,—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ে দুইশত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়"—ইত্যাদি।

খ্যাতনামা বাঙ্গালীর মধ্যে, এই মহাত্মার

বাঙ্গলাগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে পাদরী কৃষ্ণ বন্দ্যো এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও কিছু দিন বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোর "ষড়্‌দর্শনসংগ্রহ" "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রভৃতি পুস্তক, এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্র তাহার নিদর্শন। ইঁহাদের ভাষার একটু নমুনা লউন ;—

"এতদ্দেশে প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল" ইত্যাদি।—কৃষ্ণ বন্দ্যো।

"বিবিধার্থ সংগ্রহে" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন,—

"আমরা পল্লীবাসী জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি ; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে।"—ইত্যাদি।

এখন কথা এই,—বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতকাল নির্ণয় করা অতি দুরূহ। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কাল হইতে বাঙ্গলা গদ্যের উদ্ভব হয়; তৎপূর্ব্বে পয়ারাদি কবিতাই একমাত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ কথার অকাট্য কোন প্রমাণ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে, বাঙ্গলা ভাষার একটু নমুনা পাইয়াছি। "বিদ্যাসাগর"-রচয়িতা, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন,—এই পুঁথি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত, এবং নরোত্তম দাস ইহার রচয়িতা। এ নরোত্তম দাস কে, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পুঁথির একটু নমুনা দিলাম;—

"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িতা। বাহ্য-জ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানান। যে জন

চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়। বর্ত্তমান অনুমান এই রূপ।”——ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, এই উদ্ধৃত অংশটুকু ক্রিয়াবর্জ্জিত, পরন্তু অপেক্ষাকৃত সরল ও সুমিষ্ট। কিন্তু প্রকৃতই ইহা যদি তিন শত বৎসরের বাঙ্গলা হয়, তবে ইহাও একটা ভাবিবার কথা বটে। ফল কথা, লেখার ধাত বা নমুনা দেখিয়া, ভাষার স্তর-বিভাগ করা বড় কঠিন কাজ। কেবল অনুমানে ইহার উৎপত্তিকাল নির্ণয় হইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা এই আনুমানিক ‘সাহিত্যিক’ খুঁটী-নাটীর তত পক্ষপাতী নহি। মোটামুটী সকলে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন,—পাদ্রী সাহেবদের তথা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের চারিটি স্তর বা শ্রেণী হইয়াছে। “বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম” নামক গ্রন্থেও আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে একবার

আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভাষার আদিম বা প্রথম স্তর,—ভাষা গ্রাম্যদোষদুষ্ট ও অতি অস্পষ্ট এবং ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট ও ম্লান। দ্বিতীয় স্তর—সংস্কৃত ব্যাকরণের একাধিপত্য, সুতরাং অনেকস্থলে নিরর্থক শব্দাড়ম্বর ও তজ্জন্য ভাব-জটিলতা। তৃতীয় স্তরেই বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-সূর্য্য অল্পে অল্পে দেখা দিল। এ স্তরের প্রধান নেতা,—মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত।

৩

এইবার বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের যেন একটা অস্তিত্ব হইল; বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য যেন স্বতন্ত্র একটা সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হইল। এখন হইতে আর পাদ্রী সাহেবদের বাঙ্গলা এবং "তোতা পাখীর ইতিহাস" শ্রেণীর বাঙ্গলা-গ্রন্থের অধিক প্রচার হইল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়-

কুমার প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, প্রচলিত বঙ্গ-ভাষাকে সরল, সরস এবং হৃদয়গ্রাহিণী করিতে চেষ্টা পাইলেন। অক্ষয়কুমার, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া নবোদ্যমে, প্রগাঢ় পরিশ্রমে, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে বিবিধ ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে একরূপ জীবন সমর্পণ করিলেন। তাহার ফলেই তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ "ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়," "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", "চারুপাঠ" প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাঁহার লেখা, লোকে তত মন দিয়া পড়িল না।—বুঝিবার অক্ষমতা নিবন্ধনও বটে, আর ভাল না লাগিবার জন্যও বটে। কিন্তু যাই তাহার স্বাদ লোকে বুঝিল, যাই তাহার ভিতর লোকে একটু একটু প্রবেশ করিতে লাগিল;

অমনি ধীরে ধীরে তাহাতে আকৃষ্ট হইল। অক্ষয়-কুমারের চিন্তা ও ভাবুকতা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা—উত্তর-জীবনে যাহাই হোক,—সাধারণতঃ বড়ই গভীর। তাই আপামর-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে নাই এবং আজিও বোধহয় সম্যকরূপে পারে নাই। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষয়কুমারের ভাষা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার ন্যায় সরল প্রাঞ্জল মধুর ও মনোজ্ঞ নহে;—পরন্তু সে ভাষা তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী। অক্ষয়কুমার, ভাবে ও চিন্তায় মগ্ন;—ভাষার প্রাঞ্জলতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না;—অথবা বিধাতা সে শক্তি তাঁহাকে অধিক দেন নাই। পরন্তু শব্দসম্পদে অক্ষয়-কুমার বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ছিলেন এবং সেই শব্দ, প্রায় কোথাও নিরর্থক ব্যবহৃত হয় নাই। বিশেষ তাঁহার লেখার আর একটি বিশেষত্ব এই

যে,—যে কোন লেখা হোক, তাহাতে তাঁহার স্বভাবসুলভ ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর-নির্ভরতার মহান্ ভাব পরিস্ফুট। তাঁহার লেখা একটু নিবিষ্ট মনে পড়িলেই মনে হয় যে,—তিনি সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করিতেন; সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করিতেন;—কোনপ্রকার সামাজিক, বৈষয়িক বা আর্থিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান তিনি রাখিতেন না।—বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে।

অক্ষয়কুমারের যে শক্তিটির একটু অভাব ছিল, ঈশ্বরেচ্ছায়, সেই শক্তির অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া, যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ এই বার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহা হইতেই বঙ্গসাহিত্যের গঠন ও সংস্কার হইল। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, আমি এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে,—

বাঙ্গালীর গদ্যসাহিত্যের যে তিনি প্রধান পথ-প্রদর্শক ও একরূপ আদি গুরু,—তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

অক্ষয়কুমার যখন "তত্ত্ববোধিনীর" সম্পাদক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সময় অক্ষয়কুমারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেই আলাপের ফলে, "তত্ত্ববোধিনী"তে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। আদিপর্ব্বের কিয়দংশ তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া, তিনি ইহাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। পরন্তু, সাহিত্যে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ উক্ত সিংহ মহোদয়ের আরব্ধকার্য্যেও মধ্যে মধ্যে তিনি সাহায্য করিতেন। ভাষার প্রাঞ্জলতায় অথচ বিশুদ্ধিরক্ষণে তিনি এমন সিদ্ধহস্ত হইয়া-

ছিলেন যে, স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্তও তাঁহাকে আপন লেখা দেখিতে দিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সরলতা ও মধুরতা,—তাঁহার প্রথম পুস্তকেই পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি "বাসুদেব-চরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ, সে গ্রন্থে 'কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে' বিবেচনায়, গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকভুক্ত করিলেন না। পরন্তু, সে গ্রন্থের ভাষা ও ভাব এতই মনোহর যে, তাহাতেই স্বর্গীয় মহাত্মার সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। যদৃচ্ছাক্রমে, সেই গ্রন্থের এক স্থান হইতে একটুকু উদ্ধৃত করিলাম ;—

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল; গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে

নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকর-গীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল এবং শীতল সুগন্ধ মন্দ মন্দ গন্ধ বহিতে লাগিল।"—ইত্যাদি।

দেখুন দেখি, কি সুন্দর বাঙ্গলা! বঙ্গানুবাদ "কাদম্বরীর" সেই অনুস্বার-বিসর্গ-বিহীন সংস্কৃতও ইহাতে নাই, কিংবা পাদ্রী সাহেবদের সেই 'ইংরেজী-বাঙ্গলা' অথবা "তোতা পাখীর ইতিহাস" গ্রন্থের ন্যায় সেই গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট—সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়াছড়ি,—'এবং' 'ও' 'অপিচের' বাড়াবাড়িও ইহাতে নাই। বেশ একটি সরল, শুদ্ধ, সহজ, মধুর ভাব—উদ্ধৃত ঐ কয়েক পংক্তিতেই উপলব্ধি হয়। এই জন্যই লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গলা ভাষার 'জনক' বলিয়া সম্মান করে। ফলতঃ, সংস্কৃত পণ্ডিত হইয়াও যে তিনি এত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গলা রচনা করিতে পারেন, তাহা দেখিয়া সে সময়ের অনেক লোক বিস্মিত হইতেন,

আর কেহ কেহ বা তাঁহাকে ব্যঙ্গও করিতেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বেশ একটি রহস্যজনক দৃষ্টান্ত দ্বারা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—“এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন পণ্ডিত তাহা বাঙ্গলায় লিখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা-প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—‘এ কি হ’য়েছে ? এ যে বিদ্যেসাগরী বাঙ্গলা হ’য়েছে,—এ যে অনায়াসে বুঝা যায়’ !” ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সেই একাধিপত্য কালে, এরূপ ভাবে বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন করা, কম শক্তি ও সাহসের কাজ নয়।—প্রতিভাবান্ বিদ্যাসাগর সকল সময়ে—সকল অবস্থাতেই এক সোপান উচ্চে অবস্থিত। এই অপ্রকাশিত “বাসুদেব-চরিত”

গ্রন্থে, ভাবী সাহিত্য-গুরুর যে সাহিত্য-বীজ উপ্ত হয়, কালে তাহাই অঙ্কুরিত ও কাণ্ডযুক্ত হইয়া,—"সীতার বনবাস" ও "শকুন্তলা"-রূপ মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সেই বৃক্ষের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায় বসিয়া, কত শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক বিশ্রামলাভ করিয়াছে ; কত লক্ষ্যভ্রষ্ট পর্য্যটক সেই ছায়ায় শরীর জুড়াইয়া পথ চিনিয়া চলিয়াছে।—দেখিতে দেখিতে সেই মহাবৃক্ষের চারিপার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিল ;—"বিদ্যাসাগরী" ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতিভা ও মৌলিকতা অভাবে সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়।

অনুবাদে অনেক সময় মূলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বটে ; কিন্তু প্রতিভাবান্ ভাষাভিজ্ঞ লেখকের হস্তে পড়িলে সেই অনুবাদ অনেকাংশে মূলেরই ন্যায় সুখপাঠ্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে

এ কথা সম্পূর্ণরূপ খাটে। তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস,—কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তল" ও ভবভূতির "উত্তররামচরিত" অবলম্বনে লিখিত হইলেও, ইহাতে মূলের অনেক সৌন্দর্য্য আছে। ইহা ব্যতীত মহাকবি সেক্স-পিয়রের "Comedy of Errors" হইতে "ভ্রান্তি-বিলাস" অনুবাদিত করিয়া তিনি তাঁহার ভাষা-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি"ও একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক সময় বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য ছিল।

"বিধবা-বিবাহ-বিচার" গ্রন্থে আমাদের বিশেষ মতপার্থক্য থাকিলেও, মুক্তকণ্ঠে বলিব, ইহাতে স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের হৃদয় সম্পূর্ণ পরিব্যক্ত হইয়াছে। এইখানি তাঁহার সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। আর উপক্রমণিকা ব্যাকরণ প্রস্তুত-প্রণালীতে তাঁহার যে কি অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যিনি সংস্কৃত-শিক্ষার্থী না হইয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। আবার সংবাদপত্র পরিচালনেও বিদ্যাসাগরের অল্পশক্তি প্রকাশ পায় নাই। সুপ্রতিষ্ঠিত "সোম-প্রকাশের" প্রথম দশায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহার প্রধান কর্ণধার-স্বরূপ ছিলেন। অনবসর বশতঃ, কিছুদিন পরে তিনি ইহার দায়িত্ব-ভার যোগ্য-ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন। পণ্ডিত দ্বারকা-নাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশের" সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনও মধ্যে মধ্যে তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের পর, 'চন্দ্রিকা' এবং গুপ্ত-কবির "সংবাদ-প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদপত্র বাহির হয়।—উপস্থিত প্রবন্ধে আমি কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-জীবনের আলো-চনা করিতে অধিকারী; কিন্তু তাঁহার—সেই মহা-পুরুষের সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের যে বিচিত্র ইতিহাস

আছে,—যে নৈসর্গিক দয়া, যে অতুলনীয় দীন-শীলতা এবং যে অত্যুচ্চ মহাপ্রাণতায় তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন,—ভিক্টোরিয়া যুগে, সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে তত বড় লোক আর কেহ আছেন কিনা, আমি জানি না।

এই সময়ে আর একজন শক্তিশালী লেখক দেখা দিলেন। "বঙ্গসাহিত্যে টেকচাঁদঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে।—তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গলা লিখিয়াই বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি করা যাইতে পারে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুমার্জ্জিত ও সরল এবং মধুর ও মনোজ্ঞ হইলেও, তদানীন্তন ইংরেজী নবিশদিগের তাহা মনে ধরিল না।—বিশেষ তাঁহারা বাঙ্গলায় সৌখীন পাঠ্য-গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। টেক-চাঁদ ওরফে প্যারিচাঁদ দেশের হাওয়া বুঝিয়া, চলিত কথায়,সাদা-মাটা ভাষায়,"আলালের ঘরের

দুলাল” নামক উপকথা রচনা করিলেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্যাঁচার নক্সা”ও সে সময় আসর জমাইয়া ছিল। কিন্তু তাহা সাময়িক,—দিন কতকের জন্য। দিন কতক এই ‘হুতোমের’ সহিত ‘আলালী’ ভাষার বিলক্ষণ আদর হইল। এমন কি, লোকে ‘নাগরী’ ভাষার পরিবর্ত্তে, এই ‘আলালী’ ভাষাই আগ্রহে পড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সেই ‘আলালী’ ভাষার উপরও কালের যবনিকা পড়িয়া গেল।

‘আলালী’ ভাষার একটু নমুনা লউন ;—

“শামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই”—টক্ টক্—পটাস-পটাস, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে ও শালার গোরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছেকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলে গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা

বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষি-রাজের বংশ—টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলি-তেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমে চাল্ বেগড়ায় না।”—ইত্যাদি।

ইহা গেল,—বঙ্গসাহিত্যের তৃতীয় স্তরের কথা। অতঃপর আমি বঙ্গসাহিত্যের চতুর্থ স্তরের কথায়,—যে ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষের সাহিত্য-প্রতিভা আলোচনা করিয়া বিদায়গ্রহণ করিব,—তাহার পূর্ব্বের আর কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী ও প্রতিভাবান্ কবির কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি।

‘গুপ্ত’-কবি,—প্রথিতনামা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সময়ের বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। সহজ-সুন্দর-সরল ভাষায়, অতি চলিত বিষয়েও তিনি অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। ঈশ্বর গুপ্তের পরে অনেক বড় কবি হইয়াছেন বটে, কিন্তু

গুপ্তের সে ছন্দ-অলঙ্কার-মিল, সে ভাষার উচ্ছ্বাস ও বিষয় বৈচিত্র্য,—এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। রঙ্গলালের "পদ্মিনী",—একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।—এই কাব্যে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব উদ্দীপনার প্রথম সূচনা হয়। শ্রীমধুসূদন এক 'মেঘনাদ' লিখিয়াই কাব্য-জগতে অমর হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া যুগে, বঙ্গভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা, কাব্য-সাহিত্যে অতুল্য। এক হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" ছাড়া, এমন উৎকৃষ্ট মহাকাব্য এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই।—আমরা প্রধানতঃ গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতে ও তাহার ক্রমবিকাশ দেখাইতে, উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, সুতরাং কবিতা-পুস্তক সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে, সুরসিক রায় দীনবন্ধু মিত্রের স্থান বহু উচ্চে। তিনি ও রামনারায়ণ—বাঙ্গালী নাটককারগণের অগ্রণী। রামনারায়ণের

"নবনাটক", "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক" এক সময় বঙ্গসাহিত্যের মান রাখিয়াছিল। আর দীনবন্ধুর সুরসিকতা ও মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা,—সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ দীনবন্ধুর "নীল-দর্পণ" নাটকের আখ্যায়িকা,—একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ।

তৃতীয় স্তরের বঙ্গীয় সাহিত্যে, পণ্ডিত মদন-মোহন তর্কালঙ্কার ও স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মদনমোহনের সহজ সুন্দর সরল রচনা এবং ভূদেবের গভীর সমাজ-তত্ত্ব, চিরদিন লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে।

এই তৃতীয় স্তরে, আমি আর একজন প্রতিভা-বান্ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া গৌরবান্বিত হইব। তিনি ভিক্টোরিয়া-যুগে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া দেশবিদেশে সম্মানিত; সম্প্রদায়-বিশেষের আচার্য্য বলিয়াও সম্পূজিত—আমরা

কিন্তু তাঁহাকে বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ, সহায় ও স্রষ্টা ভাবিয়া সমধিক শ্রদ্ধা করি।—প্রথিত-নামা স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অনেকেই হয় ত, এ সংবাদ অবগত নন যে, চিরারাধ্যা মাতৃ-ভাষার প্রতি, মায়ের সুসন্তান কেশবচন্দ্রের কিরূপ আন্তরিক অকপট অনুরাগ ছিল। তাঁহার সেই গভীর চিন্তাপ্রসূত "জীবনবেদ" ও "প্রার্থনা" প্রভৃতি গ্রন্থ, ইহার পরিচয়-স্থল। এই সকল গ্রন্থও,—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ গৌরব।

এই গৌরবে চিরগৌরবান্বিত হইতে এবং তৎসঙ্গে দেশকে এক সোপান উচ্চে তুলিতে, অতঃপর যে ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব হইল, তাঁহার সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব।

আপনারা বোধ হয় এতক্ষণ ধরিয়া যে নাম

শুনিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, আমিও যদি ঠিক সেই নাম এক্ষণে উচ্চারণ করি, তবে আশা হয়. এই শত শত সম্মিলিত হৃদয়ের সহানুভূতি-শীতল শুভ-ইচ্ছায়, আমি ধন্য হইতে পারিব। আমার গুরু,—বঙ্গসাহিত্যের গুরু,—নব্যবঙ্গের নেতা ও পরিচালক,—অমর বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া, আমি ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের চতুর্থ স্তর বা বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃত করিব।

৪

যাঁহার উদ্দেশে এই অভিবাদন করিলাম, তিনিই বঙ্গসাহিত্যের চতুর্থ স্তরের রাজরাজেশ্বর সম্রাট। তাঁহার প্রতিভালোকে সাহিত্যের সর্ব্বদিক উদ্ভাসিত; তাঁহার পিক-কুহরিত কলকণ্ঠে দিকসমূহ মুখরিত; তাঁহার হৃদয়-পারিজাত-সৌরভে দেশ-দেশান্তর আমোদিত;—তিনি 'সাগর ঔ'

'আলালী' ভাষা দুটাকে ভাঙ্গিয়া, মিশাইয়া, নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া, পণ্ডিত ও পুরনারীর সমান আরামের জিনিস করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণে, যেমন ভক্তের প্রাণ বিমোহিত হয়; সে ধ্বনিশ্রবণে যেমন যমুনার জল, টলটল ঢলঢল করিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, লহর-মালা তুলিতে থাকে; বঙ্কিমের ভাষাতেও যেন, সেইরূপ কি-জানি-কি একটা মিশানো আছে। স্তুতি নয়—বাহুল্যবর্ণন নয়—ভক্তির অভিব্যক্তি নয়—এক্ষণে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। বঙ্কিমের বাঙ্গলা এখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সে কীর্ত্তি,—সে সৌভাগ্য,—সে আধিপত্য,—যদি তুমি বুদ্ধি-দোষে বা হিংসাবশে অথবা এমনই কোন একটা কারণে ঘুচাইতে সচেষ্ট হও, তবে তুমি নিজেই বিড়ম্বিত হইবে।—ভগবানের রাজ্যে সত্যের কিছুতেই মার্ নাই।

বস্তুতঃ আমরা অনেক ভাবিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের চতুর্থ স্তরে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ হইতেছে, ইহার মূলে বঙ্কিমের সেই প্রাণময়ী চিত্তজয়ী ভাষার আধিপত্য। বঙ্কিমের ভাষাতেই এখন—ইস্তক সংবাদপত্র হইতে নাগইদ দর্শন-বিজ্ঞান-গ্রন্থও গ্রথিত হইতেছে। অধিক কি, পুর-মহিলারা যে চিঠিপত্র লিখেন, তাহাতেও সেই বঙ্কিমের ভাবময়ী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। আর নব্যতন্ত্রের অধ্যাপক-পণ্ডিতগণও যে, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের "বুকনি" দিয়া—ব্যকরণের বাঁধন কষিয়া—সব আটঘাট বাঁধিয়াও শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনূদিত করিতেছেন, তাহাও সেই বঙ্কিমের সেই নূতন ভঙ্গিময় সন্ধি-সমাস-যুক্ত সরল-সুন্দর ভাষার একাংশ। আবার যে সব বঙ্কিম-বিদ্বেষী ভাষা-সংস্কারক, বঙ্কিমকে বা তৎপথাবলম্বী নব্য

লেখককে ব্যাকরণ-ভুলের অছিলা ধরিয়া ঘোর আক্রমণ করেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহাকে গালি পাড়েন,—তিনিও, জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই বঙ্কিমী ঢংয়েই 'শাদার পিঠে কালি' দিয়া থাকেন.—বা বঙ্কিমেরই সরস রসিকতার ব্যর্থ-চেষ্টা করিয়া উপহাসাস্পদ হন !—সোনার বঙ্কিম, ভাষার উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিয়া, প্রতিদানে নিজেই এইরূপ তীব্র শ্লেষ ও বিদ্বেষ-বাণ সহিয়া গিয়াছেন। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" গ্রন্থে সে সব কথা, আমরা ইতিপূর্ব্বেই বিশদরূপে একবার বিবৃত করিয়াছি।

বঙ্কিমের আবির্ভাব কালের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসাহিত্য প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুন্দর গদ্য সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে বড় একটা আকৃষ্ট হইলেন না,—সে বাঙ্গলা তাঁহারা কেহ বড় একটা পড়িলেন না। বঙ্কিমের যুগ হইতেই, বঙ্গ-

সাহিত্যের প্রতি ইংরেজীশিক্ষিতগণের দৃষ্টি পড়িল।

"বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া, আজ অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিতেছে। বঙ্গ-ভাষার যখন সব থাকিয়াও যেন কিছু নাই;—যখন ভাষা শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালিনী হইলেও, একরূপ অচেতন বা প্রাণহীন;—তখন অতি নিভৃতে বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, 'সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর' অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। কাল পূর্ণ হইল, সেই কর্ম্মবীরও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন;—প্রতিভাবলে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।—উপন্যাসে ইতিহাসে, সমালোচনায় সাহিত্য-সন্দর্ভে, দর্শনে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মতত্ত্বে শাস্ত্রানুশীলনে,—সকল বিষয়েই তিনি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তবে, প্রধানতঃ পাঠক জুটাইবার

উদ্দেশ্যে, তিনি তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বিশেষরূপে উপন্যাসেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মিষ্ট করিয়া গল্প বলিতে পারিলে সহজেই লোক আকৃষ্ট হয়;—অথচ কৌশলে সেই গল্পের মধ্যে সকল তত্ত্বই সন্নিবেশিত করা যায়। তাই, শক্তির অভাবে নহে—প্রধানতঃ পাঠক-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই, তিনি উপন্যাসের আসর লইয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস—হেলা-ফেলার জিনিস নয়,—একটু শ্রদ্ধার সহিত পড়িলে, তাহাতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সকল তত্ত্বই মিলিবে। বিশেষ, তাহার সহিত তাঁহার সেই স্বাভাবিক 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য' মিশ্রিত থাকায়, অতি গুরুতর জটিল তত্ত্বও সুখপাঠ্য হইবে। বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে এ গুণটা কাহারও ছিল না,—এবং আজিও এ গুণের সম্যক অধিকারী বোধ হয় কেহ হইতেও পারেন নাই। পূর্ব্বে হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামী ও ইতর

গালাগালি বুঝাইত ;—বঙ্কিমই তাহার আমূল সংস্কার করেন। এইরূপ এবং আরও অনেক রূপ উচ্চ গুণ থাকায়, বঙ্কিমের উপন্যাস, আজি 'জগতের উপন্যাস' হইতে চলিল। কেন না, ইউরোপীয় ভাষায় যখন বঙ্কিমের উপন্যাস অনূদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন দেখিতে দেখিতে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে!—ভিক্টোরিয়া-যুগে, বঙ্গসাহিত্যে এমন সৌভাগ্য আর কার? সমগ্র বাঙ্গালী নরনারীর হৃদয়ের উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন আর কে? বঙ্কিম বলিতে, বাঙ্গলার একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝায়। সত্যই, বাঙ্গলার মধ্যে, বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে, "বঙ্কিম" একজন মাত্র। বঙ্কিমকে প্রথম আসন দিয়া, ঐ প্রথম আসনের গুণের তুলনায়, ঠিক দ্বিতীয় আসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তিই বা আর কে? মুখে কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন, কোন-না-কোন প্রকারে, সাহিত্যের এই চতুর্থ

সুরে, বঙ্কিমের শিষ্য নন কে? সকলেই বঙ্কিমের প্রতিভালোকে অল্প-বিস্তর আলোকিত। বঙ্কিমের অক্ষয়কীর্ত্তি—সেই সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন"ই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

"এই 'বঙ্গদর্শন'—বঙ্গসাহিত্যের গৌরব,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। 'বঙ্গদর্শনের' আবির্ভাবে, সাহিত্য-কাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানা-জাতীয় নয়ন-তৃপ্তিকর অতি মনোহর মধু-গন্ধময় ফুলদল বিকশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয়-মারুত হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, পাদতল-বিধৌত তটিনীর গানে, প্রকৃতি হাস্যময়ী হইল; জড়জগৎ অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাসি, চকোর-চকোরীর সেই চন্দ্র-সুধাপান, ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি,—সকলই মনোহর। সত্যই 'বঙ্গদর্শন' জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র 'কোহিনূর'। যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন 'বঙ্গদর্শন'।

"কত ভাব, কত চিন্তা, কত উদ্যম, কত আশা, কত আলো লইয়া, 'বঙ্গদর্শন' জড়প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিল। এইক্ষণ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। ধর্ম্ম-প্রচারক ও নীতিবেত্তা, 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়া, গগনভেদী বক্তৃতা দিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, এক 'বঙ্গদর্শন'ই তাহা করিল। বাঙ্গালীর দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব, জীবনবৃত্তান্ত ও খাঁটী কাব্য-সাহিত্য এইবার আপন পথ পাইল। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সুদূরদর্শিতা ও সত্য-বাদিতার গুণে, 'বঙ্গদর্শন' অতি অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিল।

"ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষাকে সকলেই, বিশে-ষতঃ বিদ্বজ্জন সমাজ, অতি ঘৃণার চক্ষে দেখি-তেন। বঙ্কিম বাবু গভীর দুঃখে সে সকল কথা 'বঙ্গদর্শনের' পত্র-সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-ছেন। সমাজের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয়।

এই অবস্থায় বঙ্কিমকে বাঙ্গলা ভাষার কাণ্ডারী হইতে হইয়াছিল। বিপুল মনোবলে বলীয়ান নির্ভীক বঙ্কিম, তখন একমাত্র অদম্য উৎসাহ ও গভীর বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, সাহিত্য-সাগরে আপন প্রতিভা-তরী ভাসাইলেন। দুর্জ্জনে উপহাস করিল; ক্ষুদ্রচেতা টিটকারী দিল; অধমাত্মা বিফল-মনোরথ করিতে চেষ্টা পাইল;—ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ, কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—কিছুতেই দৃক্‌পাত করিলেন না,—একাগ্রচিত্তে আপন লক্ষ্যপথে চলিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিভারই জয় হইল। লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমের লেখাই পড়িতে লাগিল।”

আজ সেই ভাষার বিস্তৃতি ও প্রসার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বড় জোর চল্লিশ বৎসর, বঙ্কিমের ভাষা চলিয়াছে,—ইহারই মধ্যে তাহাতে কি অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার! এক্ষণে যে বাঙ্গলা সাহিত্যে নানা-শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—

দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প কৃষি, ইতিহাস জীবনবৃত্ত, পুরাবৃত্ত প্রত্নতত্ত্ব, গণিত রসায়ণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই কোন-না-কোন গ্রন্থ দেখা যাইতেছে,—ইহারও মূল বঙ্কিম। বঙ্কিমই প্রথম, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গলা গ্রন্থের প্রচার করিয়া, রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজ যে এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের একটু খোঁজ-খবর রাখেন, ইহার মূলেও বঙ্কিম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা না চলিত;—বাঙ্গলা সাহিত্য যদি একমাত্র সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ইহার এরূপ প্রসার ও প্রতি-পত্তি কখনও সম্ভবপর হইত না। অতিরিক্ত বিজ্ঞতা ও সহজসুলভ মুরুব্বিয়ানাটুকু ছাড়িয়া দিয়া, একটু ধীরভাবে উদারচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মাত্র ৫০।৬০ বৎসরে একটা পরাধীন জাতির মধ্যে ভাষার কি অভাবনীয়

শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখন কোন কোন মহানুভব ইংরেজও যত্নপূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ উত্তমরূপ বাঙ্গলা শিখিয়াছেনও। বাঙ্গলার কোন কোন গ্রন্থ,ইংরেজীতে অনুবাদিতও হইয়াছে। যখন রাজার জাতি ইংরেজ, মাৎসর্য্য-অহমিকা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা শিখিতে—বাঙ্গলার ভাব ও চিন্তা উপলব্ধি করিতে এবং বাঙ্গলার কাব্য-রসের আস্বাদন লইতে উদ্‌গ্রীব ;—তখন যে বাঙ্গলা ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি বা শক্তিসঞ্চার হয় নাই,—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে বসিয়া, এ কথা কিরূপে স্বীকার করি? যাহাই হউক, এ সকলের মূল বঙ্কিম। বঙ্কিম বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে না নামিলে,—বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা না করিলে, বাঙ্গলা সাহিত্য আজ কখনও রাজা প্রজা উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না ;—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায়ও বাঙ্গলা সাহিত্যের

প্রবেশচেষ্টা হইত না। সুতরাং সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞ—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। অন্ততঃ কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। অবশ্য বঙ্কিমের লেখা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং উহাই যে সাহিত্যের চরম, এমন কথা বলিতেছি না। গুণ থাকিলে যে দোষ থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। পরন্তু গুণের তুলনায় দোষের ভাগ—বঙ্কিমের লেখায় খুবই কম। সে কমও যাঁহারা বুদ্ধি-দোষে বা ঈর্ষাবশে অথবা এমনই কোন একটা কারণে—অত্যধিক মাত্রায় পরিণত করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও কৃপার পাত্র;—এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন, উপস্থিত সময়ে বঙ্কিম-ভক্তগণের আর কোনও সান্ত্বনা নাই।”

৫

ভিক্টোরিয়া রাজত্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের এই যে শুভ অবস্থা,—এই যে আশার ক্ষীণরশ্মি,—ইহাতে

আকৃষ্ট হইয়াই আমরা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বীকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করি। বলিয়াছি ত, তাঁহার সেই ৫৮ সালের 'অভয়বাণীর' ঘোষণা না হইলে, ভারতের কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইত না!

ভারতে ইংরেজীশিক্ষা বিস্তারের প্রতিও জননীর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। সেই ইংরেজী শিক্ষার গুণেই ভারতবাসী আপনাদের জাতীয় অভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।—শিক্ষিত বাঙ্গালী তাই বঙ্গসাহিত্যের সেবায় মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা যেন ক্রমশই বুঝিতেছেন, অগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি না হইলে, কোন বিষয়েরই উন্নতি হইবে না। তাই বাঙ্গালী-জীবনে, সহস্র দুঃখ-দুর্গতির মধ্যেও বঙ্গ-ভাষার এই ক্রমবিকাশ। মূল, স্বভাবের নিয়মবশে এই ক্রমবিকাশ হইয়াছে সত্য; পরন্তু আমরা, রাজভক্ত কৃতজ্ঞ হিন্দু সন্তান;—তাই আমাদের

সৌভাগ্য-সূচনার এই ক্ষীণ রশ্মির মধ্যেও আমরা রাজরাজেশ্বরী জননী ভিক্টোরিয়ার সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই। অপিচ এই সাহিত্য হইতে সমাজ, সমাজ হইতে জাতীয়তা, জাতীয়তা হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে ধর্ম্ম,—সকলই পরস্পর শৃঙ্খলিত। পরন্তু এই ধর্ম্ম বিষয়ে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে কিছুই হয় না। তাহা যে হয় নাই, তাহা সেই কৃপাময়ী রাজ-লক্ষ্মীর অন্তর্দৃষ্টির গুণে। ধর্ম্মের অবতার স্বরূপিণী মাতা বুঝিয়াছিলেন,—মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার উন্মুক্ত ও চিরস্বাধীন না হইলে, মানুষ কখনও মানুষ হইবে না। মায়ের সেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সফল হইয়াছে। আমরা আর যাহাতে সামান্য হই,—আমাদের সনাতন ধর্ম্মাশ্রিত সাহিত্য,—সামান্য নয়। একজন সহৃদয় ইংরেজ-লেখক বলিয়াছেন,—"প্রকৃত বাঙ্গলা অতি সম্ভ্রান্ত ভাষা। এমন কোনও ভাব নাই, যাহা শ্লায়ত, তেজের

সহিত, বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না।”

বড় দুঃখ, তথাপি কোন কোন ‘শিক্ষিত নামধারী বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গলা পড়া বা বাঙ্গলা লেখা অপমানকর বোধ করেন! কিন্তু এইটুকু তাঁহাদের বুঝা উচিত,—বাঙ্গলায় আর এখন সে দিন নাই;—দু’ছত্র ইংরেজী লিখিতে পারিলে বা ইংরেজী ভাষায় দু’টা বক্তৃতা দিয়া আসর জমাইতে পারিলে, এখন আর লোক ভুলে না। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অনুরাগ এখন তাহার জাতীয় ভাষায় আসিয়াছে। কলিকাতার দুই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াও, বিনা আবশ্যকে, কখনই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন

---

* Author's Preface, Yates' Introduction to Bengali Language.

না—স্বভাবসুন্দর সরল মাতৃভাষায় সকল কাজ সম্পন্ন করেন।

বিশেষ, বাঙ্গালী লেখক এখন রাজদ্বারেও সম্মানিত। কেবলমাত্র বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই, কেহ কেহ রাজদত্ত উপাধিও লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী অক্ষম কবি ও গ্রন্থকার রাজবৃত্তি লাভে উপকৃতও হইয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গলা গ্রন্থের প্রকাশকও রাজপ্রশংসাপত্রলাভে বঞ্চিত হন নাই। এ সকলই আমাদের শুভঙ্করী স্বর্গীয়া রাজ্ঞীরই রাজত্বকালে। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে, ভিক্টোরিয়া যুগেই, আমাদের সাধের বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্ব্ববিধ শুভ সুচনা। তাই সভক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে, বার বার সেই স্বর্গীয়া জননীর গুণ-গান করিতে ইচ্ছা হয়।

বিধির বিধানে মাতা ভিক্টোরিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন; তাঁহার সোনার সিংহাসনে

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র—আমাদের বর্ত্তমান রাজ-রাজেশ্বর—ভারত-সম্রাট—সপ্তম এডওয়ার্ড উপ-বিষ্ট। ভগবান্ তাঁহাকে মাতৃপদাঙ্ক অনুসরণে যশস্বী করিয়া নিরাপদে রাখুন এবং চিরসুখী ও চিরজীবী করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বে বাঙ্গলা-সাহিত্যের যে উন্নতি-সূচনা হইয়াছে, আশা আছে, নব-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে তাহা আরও দৃঢ় হইবে;—তাঁহার শান্তিময় শাসন-শৃঙ্খলায় ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহিত, ভারতের সাহিত্যও সম্যক পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

ভিক্টোরিয়া-যুগের শেষদশায় যে সকল প্রতিভা-বান্ নবীন লেখক সাহিত্যে আসর লইয়াছেন, নব-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বেও তাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিতে থাকিবেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা, যুক্তিযুক্ত

মনে করি না। আর যে সকল প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, ঈশ্বরেচ্ছায় দীর্ঘজীবী হইয়া, আজিও আত্মার উৎকর্ষ-সাধন-স্বরূপ সাহিত্যানুশীলন করিতেছেন এবং নবীন-সম্রাটের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেও যাঁহা-দের সাহিত্য-সাধনা চলিতে থাকিবে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও, উপস্থিত প্রবন্ধে, নানা কারণে, কোন কথা বলা সমীচীন বোধ করিলাম না। ফল কথা, বঙ্কিমের অমর আত্মার উৎকর্ষ সম্ভূত যে ভাষা ও ভাব,—যে কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য-সুধা ;—যাহা পানে, বাঙ্গালী পাঠক তন্ময় হইয়া গিয়াছে ; তাহা ভুলিয়া অন্যের কোন নূতন সুরে বুক বাঁধিতে, এখনও বহু বিলম্ব আছে। অপিচ, এখন যিনি যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা সেই বঙ্কি-মেরই আরব্ধ-কার্য্যের উপসংহার মাত্র। তবে আমাদের আশা আছে, এবং বিধাতার বিধানেও বিশ্বাস করি যে, ঠিক আবশ্যক হইলে, যথাসময়ে

আমরা আর একজন "বঙ্কিম" পাইব। এখন কিন্তু সে বঙ্কিম কেহ হন নাই।

বঙ্গভাষার পূর্ব্ব আচার্য্যগণ, কত কষ্টে, মাতৃ-স্বরূপিণী ভাষাকে, সেবা ও পূজা দ্বারা, শক্তিময়ী সম্পদময়ী প্রাণময়ী করিয়া গিয়াছেন;—আমরা কি, আচার্য্যগণের সে মহাদর্শ গ্রহণ করিয়া, মাতৃপূজা দ্বারা আত্মার উৎকর্ষসাধন করিব না? যদি, মাত্র ৫০।৬০ বৎসরের চেষ্টায় অনাদৃত বাঙ্গলা ভাষার এই অভাবনীয় উন্নতি হইতে পারে, তবে এই সর্ব্বজন-সমাদৃত বঙ্গসাহিত্যের এই সম্মানিত যুগে,,—বিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভে,—নব সম্মানিত রাজরাজেশ্বরের এই শান্তিময় শাসন-কালে,—সে ভাষা যে কত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা, সহৃদয় সভ্যবৃন্দ, মনে মনে একবার চিন্তা করিবেন।

৩০শে মাঘ, ১৩০৭।

সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব। *

সৃষ্টি-রহস্য অজ্ঞেয়, মনুষ্য-প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। সৃষ্টির মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া এবং মনুষ্য-প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, যে শক্তিধর পুরুষ কোন অলৌকিক সত্য বা মূলতত্ত্ব প্রকটিত করেন, তিনি মানব-সমাজের বন্ধু,—সমগ্র পৃথিবীর পূজাস্পদ। প্রধানতঃ বিষয়-বিতৃষ্ণ, জ্ঞানমার্গাবলম্বী,—সাধক, যোগী ও তত্ত্ব-জ্ঞানী এই পথের পথিক। ইঁহারা আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে,—জীবের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়াও

* কলিকাতা—বহুবাজার "সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের" বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত;—উপস্থিত সংশোধিত।

ইঁহারা সংসারীর জন্য চিন্তা করেন; মানব-হিতের জন্য ইঁহারা প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদের সাধনা-সমুদ্ভুত, ধ্যান ও ধারণা-প্রসূত মহাসত্যের দুই একটা কণিকা লইয়া,—ভক্ত ও ভাবুকের অভ্যুদয়। কবি ও দার্শনিক,—সেই ভক্ত ও ভাবুকের ক্ষুদ্র শিষ্য। চিন্তা ও ভাব-রাজ্যের অধিপতি হইলেও, কবি ও দার্শনিককে,—প্রকৃত ভক্ত ও ভাবুকের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। কারণ প্রকৃত কবি ও দার্শনিক,—অহমিকা-শূন্য;—সত্য ও সৌন্দর্য্যের চরণে বিলুণ্ঠিত হওয়া তাঁহারা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। প্রকৃত ভক্ত ও ভাবুক, সেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকট মূর্ত্তি।

সত্য ও সৌন্দর্য্য হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। সত্যের ধারণা ও সৌন্দর্য্য-বোধ যাঁহার যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেন। যাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি

করিবার সৌভাগ্য নাই, তিনি সেই শক্তি বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করেন। মানব-সেবাই তাঁহার ধর্ম্ম; মনুষ্যত্ব অর্জ্জনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের একাধারে এই দুই শক্তি থাকে, মনুষ্যবেশে তিনি দেবতা। সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী—চিরদিন তাঁহাকে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দেয়।

এখন এই সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব কি, অদ্য তাহাই আমাদের আলোচ্য। সংক্ষেপে ব্যষ্টিভাবে আমরা এই কথাটির আলোচনা করিব।

যে দিন জগতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত ভাবের সমষ্টিই ভাষা,—এবং সেই ভাব-প্রকাশের নামই ভাষা। জাতি বিশেষের সাহিত্য নাই বটে, কিন্তু ভাষা সকল জাতিরই আছে। সেই সনাতন বৈদিক যুগ হইতে অনাদি

কাল ধরিয়া যে ভাব-স্রোত চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাষা। ভাষা,—সাহিত্যের প্রসূতি। সাহিত্য হইতে সমাজ, সমাজ হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যত্ব। পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ; পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একটি ছাড়িলে আর একটি নিষ্প্রভ হয়; একটির অস্তিত্ব অভাবে আর একটির অস্তিত্বও ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত সাহিত্যকার এই তিনকে একই কেন্দ্রে পরিণত করিয়া, তাঁহার অমানুষী প্রতিভা পরিচালিত করেন। তাহার ফলে মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রিক্ত হয়, কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি জন্মে। সহানুভূতি হইতে একতা, একতা হইতে সভ্যতা, সভ্যতা হইতে জাতীয়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাতীয়তাই জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান। যে জাতির জাতীয়তা বা একপ্রাণতা নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। সে জাতি জন্ম-

গ্রহণ করে,—পরপদ লেহন করিবে বলিয়া ; সে জাতি বাঁচিয়া থাকে,—অন্যের উপহাসাস্পদ হইবে বলিয়া ; সে জাতির অস্তিত্ব,—পরস্পর রেষারিষী-দ্বেষাদ্বেষীতে জ্বলিয়া মরিবে বলিয়া। "তাহারা জাগিয়া থাকে, ঘুমাইবার লোভে ; ঘুমায়,—আর জাগিতে পারে না বলিয়া"।— আলস্যে তুড়ি দিয়া জৃম্ভন তুলিতে তুলিতে, অদৃষ্টের নামে কাপুরুষতার দোহাই দিতে দিতে, তাহারা দিনের পর দিন গণিয়া যায় ; আর কালের ডাকে, যথাকালে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে !

এই নিদ্রালস জীবন্মৃত জাতিকে উদ্বোধিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হয়। কারণ সাহিত্যই সর্ব্ব বিষয়ের মূল এবং মেরুদণ্ড। মূল এবং মেরুদণ্ডকে সর্ব্বাগ্রে পোষণ ও রক্ষা না করিলে, কিছুই থাকে না, কিছুই হয় না। বুনিয়াদ পোক্ত

না হইলে সুরম্য হর্ম্ম্য ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া যায়; জাতীয় সাহিত্যের মূল দৃঢ় না হইলে জাতীয় জীবনেরও অবসান হয়;—তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ও, আধারাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত্যই এই সকলের আধার। সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া কিছুই চলিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি আবশ্যক। সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া,—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা—সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই;—সেই সত্য সাহিত্যের অন্তস্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কেহ নাই;—সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপান। উচ্চে উঠিবার অগ্রে, আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। প্রাণ দিয়া, প্রেম দিয়া, উন্মাদিনী শক্তি দিয়া সাহিত্যকে জীবনের

আদর্শ করিতে হইবে। ভক্ত যেমন প্রীতিভরা অশ্রুজলে হৃদয়-তল ধৌত করিয়া আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করেন,—প্রকৃত সাহিত্যসেবীও তেমনই সর্ব্বান্তঃকরণে, অকপটে সাহিত্যধর্ম্মের সেবা করেন। তাঁহাতে কৃত্রিমতা বা ভাণ, পরমুখপ্রেক্ষিতা বা লাভ-লোকসানের খতিয়ান্ থাকিতে পারে না। তিনি সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন; সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এই সাহিত্যই—সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রাণের স্পৃহনীয়,—আত্মার খাদ্য। কবিত্বই ইহার প্রাণ; উচ্চ আদর্শই ইহার লক্ষ্য। এই সাহিত্য হইতেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতেই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির কি ধর্ম্ম নাই? উত্তর—হাঁ, আছে;—তবে সে ধর্ম্ম অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারময়,—সুতরাং একরূপ জীবনশূন্য। সে

ধর্ম্মে সমাজ গঠিত হয় না, সভ্যতার বিস্তার হয় না, কোন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনা হয় না,—তাহা জড়-ভাবাপন্ন মাত্র। তাহাতে ঘাত প্রতিঘাত নাই, আলোক আঁধারের পার্থক্য নাই, স্বার্থ ও পরার্থের সূক্ষ্ম তারতম্য নাই, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংঘর্ষণ নাই,—তাহাতে কোন রকমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। পরন্তু যাহাতে মানব-জন্ম সার্থক হয়,—যাহাতে মনুষ্যত্বের মোহন বিকাশ হয়, তাহার বীজ সে ধর্ম্মে নাই।

এখন, এই মনুষ্যত্ব কি? উত্তরে অনেক কথা আসে,—অনেক মতও আসিয়া পড়ে। সে কথা, সে মত সম্যক অলোচনার স্থান ইহা নহে। অতি সংক্ষেপে, মাত্র একটি কথায়, আমরা ইহার উত্তর দিব। মনুষ্যত্ব কি? উত্তর—

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"

কথাটা যত বার—যত রকমে—যেমন ভাবে আলোচনা করিয়াছি, মনের মধ্যে ঐ একই উত্তর

পাইয়াছি,—"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"—হিন্দুর চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই উপদেশ দেয়, মুসলমানের কোরাণও এই শিক্ষা দেয়, আর খ্রীষ্টানের বাইবেলও এই কথা বলে। সাহিত্য বা কাব্য, এই মহাভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃত সাহিত্যকার এই মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার বিশাল কাব্য-চিত্রপটে, জীব ও জগৎ অঙ্কিত করেন। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, তাহা টানিয়া বাহির করেন। জীব কি, জগৎ কি, উভয়ের সম্বন্ধ কি, মানবের কর্ত্তব্য ও পরিণাম কি, ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার চিন্তা ও ভাব, আপন তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম বিশাল হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া,—সেই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ, কাব্যে বা সাহিত্যে তাহাই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কারণ, "কবির সৃষ্টি, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া আমি মনে করি না। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের

ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সত্য ও সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ;—সত্য ও সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ,—সত্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। প্রকৃতির ছায়া এই সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কোমল ও কঠোর, দুই লইয়াই প্রকৃতি। চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলোক ও ছায়ার প্রয়োজন, প্রকৃতির পূর্ণতার জন্য সেইরূপ কোমল ও কঠোর,—দুয়েরই প্রয়োজন। এই দুয়ের সমাবেশ বড়ই গভীর ও রহস্যময়। এবং এই কোমল ও কঠোরের সমাবেশে, মানব জীবনের মহাসমস্যা, স্বরচিত 'ছকে' মিলাইয়া, কবিকে একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। সুতরাং কবির কাজ অতি উচ্চ ও মহৎ।" এই জন্যই আমি প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, প্রকৃত কবি ও দার্শনিক,—সাধক, যোগী বা তত্ত্বজ্ঞানী, এবং ভক্ত ও ভাবুকের ক্ষুদ্র শিষ্য। সংসারে

থাকিয়াও তাঁহাদিগকে একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হয় ;—একটু নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হয়। সাধারণ বিষয়ী লোকের মত তাঁহাদের ধাত হইলে তাঁহাদের লেখার ধাতও খাঁটী হয় না, স্থায়ী সাহিত্যেও তাহা স্থান পায় না। কারণ সত্য-সেবী, সত্যের উপাসক, সত্যের প্রচারক হইতে হইলে, তাঁহাকে বড় কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয় ;—সাময়িক সুখ্যাতি অখ্যাতি, নিন্দা যশঃ, লাভ ক্ষতি, শত্রুতা মিত্রতা,—এ সকলকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাকে আপন গন্তব্য পথে চলিতে হয়। এমন কি, সত্যের ধ্যান ও ধারণায় তন্ময় হইয়া,—বাক্যে কথনে, মনে জ্ঞানে, ভাবে ব্যবহারে,—অসত্যের ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ না করিয়া তাঁহাকে থাকিতে হয়। সংসারের নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতন, অদৃষ্টের তাড়না ও বিড়ম্বন, পদে পদে তাঁহাকে সহিতে হয়। কোন এক ঈশ্বরজ্ঞানিত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—"দ্বাদশ

বর্ষকাল অনন্যমনা হইয়া সত্যের সেবা করিলে, মিথ্যায় আর মন আসিবে না; অসত্যে আর প্রবৃত্তি হইবে না।”—হায়, দ্বাদশ বর্ষ! মোহান্ধ মায়ার জীব,—দ্বাদশ মুহূর্ত্ত, দ্বাদশ পলও সত্যে অটল আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ! এমত অবস্থায় নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইবে কিরূপে? সেই জন্যই না হিন্দুর বেদই একমাত্র সনাতন সাহিত্য? আর সত্যময় হইয়াছিলেন বলিয়াই না ভারতকার ব্যাস আপন মাতৃজারত্বও অম্লানবদনে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আর, সেই জন্যই না সেই পঞ্চমবেদ-প্রণেতা 'ব্যাসো নারায়ণঃ হরিঃ' ইত্যাকার বিশেষণে অভিহিত হন? হায় সত্য! তোমার সৌন্দর্য্যে যে বিমোহিত হইয়াছে, সে কি আর লোক-লৌকিকতার ধার ধারে?—না, পৃথিবীর যশ-নিন্দায় স্ফীত বা সঙ্কুচিত হয়?

তোমাতে মোহিত হইয়া ছিলেন বলিয়াই, মহাত্মা সক্রেটিশ বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; আর মহামতি খ্রীষ্ট জীয়ন্তে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ দিতেও পশ্চাদ্পদ হন নাই!

এই সত্য, এই সৌন্দর্য্য, এই মহাদর্শ, এই অলৌকিক সজীব চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া কবি ও দার্শনিক ক্ষণকালের জন্য বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হন, আপনাকে বিস্মৃত হন, গভীর ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করেন। সেই রত্নের বিমল শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমেই মানবের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিতে থাকে; হৃদয় ও মন প্রশস্ত হয়; হিংসা দ্বেষ, কুটিলতা ও বক্রতা এবং নীচতা ও স্বার্থপরতা ক্রমেই বিদূরিত হইয়া যায়; তখন মানব,—"জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—এই মহাসত্য ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়।

সাহিত্যের এই যে উচ্চ আদর্শ, ইহা এখন

পাইব কোথায় ? ইহা দিবে কে ? ধর্ম্মগ্রন্থ, শাস্ত্র-গ্রন্থ, অথবা নীতিগ্রন্থ ত তেমন সহজ-পাঠ্য নয় এবং সেই হিসাবে ইহা তেমন মনোজ্ঞও নয় ;—তবে সাহিত্যের এই উচ্চ আদর্শপূর্ণ গ্রন্থ এখন দেয় কে ? দার্শনিক ত একটা গম্ভীর বিষয় লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে করিতে মন-মরা করিয়া মাথা ঘুরাইয়া দেন ; বৈজ্ঞানিক তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন,—তিনি আবার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আবিষ্কারার্থ কতই না সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, একীকরণ, যন্ত্রসংযোগ প্রভৃতিতে ক্ষীণপ্রাণ মানবের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করেন ; প্রত্নতত্ত্ববিদ্—পুরাকালীন তত্ত্বসংগ্রহে ও তাহার আমূল ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেই তৎপর ;—এখন মানুষকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও স্বল্পায়াসে, আশার মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায় কে ?—মহাপ্রাণ কবিই সে ভার গ্রহণ করেন। তিনিই মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক, আশ্বাস-

দাতা, বন্ধু ও গুরু। বস্তুতঃ, কবির তুল্য লোক-শিক্ষক আর কেহই নন। কবিই প্রকৃত সাহিত্য-কার এবং কবিতাই প্রকৃত স্থায়ী সাহিত্য। কবিতা অর্থে এখানে কেবলই ছন্দো-বন্ধ-সুর-তান-লয়ে-গাঁথা—পদ্য বুঝিতে হইবে না,—সত্য ও সৌন্দর্য্যময়, চির-নূতনত্বপূর্ণ, বৈচিত্র্যময় গদ্য সাহিত্যও কাব্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্ত-মান বিস্মৃত হইয়া,—যথাসত্য, যথাজ্ঞানে, মনুষ্য-জীবনের প্রহেলিকা চিরদিনের জন্য লোক-শিক্ষার বিষয়ীভূত করিতেই কবির জন্ম। জগ-তের অভ্যন্তরস্থ করুণ ক্রন্দন, বিশ্ববাসী নরনারীর অরুন্তুদ রোদন,—আপন প্রাণে উপলব্ধি করিতেই বুঝি কবির অভ্যুদয়। তাই মহাপ্রাণ কবি গভীর সহানুভূতির সহিত জগতের সেই মহাদুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হন। আশ্বাস দিয়া, উপায় দেখাইয়া, পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, তিনি তাঁহার

ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা করেন। পুলপিটে দাঁড়াইয়া, বক্তৃতা না দিয়া, 'এই কর' না বলিয়া, তিনি একটি 'মনের মানুষ' অঙ্কিত করিয়া দেন, এবং তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও কার্য্যাবলী এমনই ভাবে চিত্রিত করিয়া থাকেন যে, নিরাশপ্রাণ মহাদুঃখীও তাহা দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করে ;—কাঁদিতে কাঁদিতেও নির্ম্মল সুখের আস্বাদ পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কবির যে কাব্য, তা পদ্যই হোক্ আর গদ্যই হোক্,—স্থায়ী সাহিত্যে তাহার স্থান সকলের উচ্চে। এই জন্য সকল দেশে, সকল সমাজেই কাব্য-গ্রন্থের এত আদর! কাব্য,—উচ্চ আদর্শপূর্ণ, চির-নূতনত্বময় ; তাই সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য সকলকে সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে, জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে,—এমত অবস্থায় কেবলই কাব্য লইয়া থাকিলে চলিবে না—তজ্জন্য

ঘটনামূলক স্থূল সাহিত্য এবং সাময়িক সংবাদাদি পূর্ণ হিসাব-নিকাশ-বিশিষ্ট জীবিকা-উপায়োপ-যোগী গ্রন্থেরও প্রয়োজন। এবং এই হিসাবে অর্থনীতি, বৈষয়িকনীতি ও রাজনীতির আলোচনা করাও বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এ কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, উহাতে আত্মার উৎকর্ষসাধন হয় না।—মনুষ্যত্বের যাহা মূল বীজ,—সাধনার যে উচ্চ অঙ্গ, তাহা উহাতে অধিক নাই।

এ পর্য্যন্ত আমি কবি ও কাব্যেরই উল্লেখ করিয়াছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে কেহ মনে করেন, সাহিত্যের নামে, কবি ও কাব্য আসিল কেন? এ কথায় আমার বক্তব্য এই,—প্রকৃত কাব্যই—সাহিত্য। কাব্যকে ছাটিয়া ফেলিলে সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। মহামতি দক্ষরাজ শিবকে বাদ দিয়াও যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন! সেইরূপ,

কাব্যকে বাদ দিয়া সাহিত্যের আলোচনা করাও একরূপ স্পর্দ্ধার কথা। দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে এই কৈফিয়ৎ টুকু দিবার প্রয়োজন আছে। কেন আছে,—সে কথা হয়ত আমায় আর এক দিন বলিতে হইবে।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম ঃ—সাহিত্য হইতেই মনুষ্যত্ব। "আপনাকে লইয়া থাকাই মনুষ্যত্ব নহে। যাহা নিকৃষ্ট জীবের লক্ষ্য, মনুষ্যের লক্ষ্যও তাহাই নহে। মনুষ্যকে তাহার লক্ষ্য বুঝাইতে, তাহার অন্তরে জ্ঞানশিখা প্রজ্বালিত করিতে এবং রক্তমাংসের শরীর ভুলাইয়া চিন্তা ও বুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম অধিকার দিতে,—এক কথায় দেহকে ছাড়িয়া মনকে বুঝিতে শিক্ষা দেওয়াই, কবির কাজ। সর্ব্বথা, প্রতিভাবান্ কবিও তাহাই করিয়া থাকেন।" সেই জন্যই কবি জগতের বন্ধু,—সমগ্র নরনারীর প্রীতির পাত্র। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যখন মূলের

অনুসন্ধান করিতে করিতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত রাজ্যে গিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন এক হিসাবে তিনিও কবি হন; তাঁহার 'তত্ত্ব' তখন কবির স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যানুভবে মিশিয়া এক হইয়া যায়;—সে এক মহাযোগ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মৃত্যুকে উল্লেখ করিতে পারা যায়। মৃত্যুর পরে যে কি হইবে, তাহা কবিও যেমন বুঝেন, দার্শনিকও সেই রূপ বুঝেন, বৈজ্ঞানিকও তদ্রূপ বুঝিয়া থাকেন। অথবা, এ তিনের কেহই কিছুই বুঝেন না। না বুঝিয়া, শেষোক্ত দুই জন কিছু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হন; কিন্তু প্রথম জন তখনও আশা ছাড়েন না,—তখনও তিনি আশার অমৃতময়ী দেব-বাণী শুনাইতে থাকেন। সে কি অপূর্ব্ব মধুর সান্ত্বনা!

কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য জগতে এক রব উঠিয়াছে,—'বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত কবিতা ক্রমশই লয় প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

কবিত্বের বিলোপ,—ইহা কি সম্ভবপর? "না, এ কথা মানিতে আমরা প্রস্তুত নই। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কবিতার উৎপত্তি, তখন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা অনন্তকাল স্থায়িনী হইবে। মানুষ যত দিন মানুষ থাকিবে, অথবা মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিবে, তত দিন কবিতাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতে থাকিবে। এবং সেই সঙ্গে তাহার শোভা, শ্রী, সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, যাহা জীবনের সান্ত্বনা এবং আত্মার খাদ্য, তাহাই কবিতা,—এবং তাহার অনুশীলন করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

কবিতার বিলোপ অসম্ভব। 'বিজ্ঞানের আলোকে কাব্যের স্ফূর্ত্তি হয় না'—একথা কখন বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও কাহারও ধারণা,—'কবিতা অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ

চেতনা অৰ্দ্ধ স্বপ্ন, অৰ্দ্ধ স্মৃতি অৰ্দ্ধ বিস্মৃতি!—যেন প্রাণটা কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, প্রখর রবি-কিরণে তাহা ফুটিয়া উঠে!—কিন্তু বিজ্ঞানের আলোক এতই সত্য, এতই তীব্র, এতই জ্বালা-ময় যে, ক্ষীণপ্রাণ কবিতা প্রাণভয়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!'—এ কথা আমরা এত দিন বলিতে শিখি নাই—শুনিয়াছি নাকি, এ কথা কোন্ সুসভ্য, সুশিক্ষিত সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছে! আমরা তাঁহাদের কাছেই ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শুনিয়া থাকি যে, সেই দেশে যখন বিজ্ঞানের বড় আদর, বড় খ্যাতি, বড় স্ফূর্ত্তি, কবিতা তখনও সেখানে রত্ন সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা! তাই বলিতেছিলাম, কবিতার বিলোপ নাই। তাহা হইলে এই অপূৰ্ব্ব কবিত্বময় নিখিল সংসার,—এই অসীম রহস্যময় মানব-জীবন সঙ্গে সঙ্গেই যে বিলুপ্ত হইবে! হায়! সে অনন্ত

শূন্যে, জানি না, কোন্ মহাপুরুষ বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্রীড়া-কৌতুক দেখিবার জন্য জাগিয়া থাকিবেন!

এখন, এ মহাবস্তু কবিতা পাইব কোথায়? মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই তাহা পাইব। বিশ্ব-প্রকৃতির জাগ্রৎ জীবন্ত ভাব দেখিয়া যে মহাদর্শের সৃষ্টি,—যাহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয় এবং প্রাণের আবেগে বলিতে হয়—'হে কবি! তুমি কোথায়? হে প্রকৃতি! তুমি কে? কবি কে?'—প্রকৃত সাহিত্যকার কবি সেই মহা সত্য প্রচার করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন, এবং সেই সত্যের আলোকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিয়া আমরাও ধন্য হই।

বলিবে, অনেক সময় সাধারণ মনুষ্যের অনতিক্রমণীয় পথে মহাকবির মহতী প্রতিভা চলিতে থাকে,—তাহাতে সমাজের লাভ কি? হাঁ, লাভ আছে বৈ কি? "সেই প্রতিভা মর্ত্ত্যলোক

ছাড়িয়া অনন্ত গগনে বিলীন হইয়া যায়—যাউক ; মায়ামন্ত্রে স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে থাকুক ;—কল্পনা-রথে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে,লোক লোকান্তরে বিচরণ করে করুক ; তাহাতেই সেই প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কেন না, সেই প্রতিভাকে আবার মনুষ্য-সমাজে ফিরিতে হয়। উষার স্নিগ্ধ আলোকে আপন কুলায় ছাড়িয়া যে পক্ষী অনন্ত গগনে উঠিয়া অমর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ও মধুর ছায়ায় তাহাকে আবার নামিতে হয়।"

কাব্যেরও সেইরূপ,—কখনও বা মানস-চক্ষের অতি দূরে ঊর্দ্ধ-গমন আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা যতই ঊর্দ্ধে বিচরণ করুক, তাহার মূল তোমার আমার অন্তরের অন্তরে নিহিত আছে। লকে-বাঁধা ঘুঁড়ি কত ঊর্দ্ধে উঠিবে উঠিতে দাও—সেত ক্রীড়ার পদার্থ মাত্র। আমার প্রাণের কথা

বলিতে বলিতে যখন তোমার মহতী প্রতিভা অনন্ত শূন্যে উঠিতে থাকিবে, তখন কি তুমি মনে কর, আমিই পড়িয়া থাকিব? না, আমার প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গেই উঠিতে থাকিবে! পথ অনন্ত, জীবনও অনন্ত;—অনন্তে তোমায় আমায় একাকার হইয়া যাইব! যদি প্রতিভার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে সে কেবল ঐ লকে-বাঁধা ঘুড়ির মত—একবার উঠিল, আবার বালকের ইচ্ছানুরূপ অল্প আকর্ষণেই নামিয়া পড়িল। তাহা প্রতিভা নহে,—প্রতিভার ভ্যাঙ্গানি মাত্র।

সুতরাং, কাব্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীতে অগ্রসর হইলে, নিরাশায় নয়ন ফিরাইও না। কাব্য কেবল ইহলোক বা ইহজীবন লইয়া নহে। তাহা হইলে ইহার রূপান্তর হইত। যতই ঊর্দ্ধে উঠুক,—কাব্য তোমাকে-আমাকে ভুলিবে না;—ভুলিতে পারেও না। কারণ তোমার আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-পটে

বিশাল বিশ্বের মহাদর্শ দেখাইতেই তাহার প্রয়াস।

এই জন্যই কাব্য, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারে না;—দেশ কাল পাত্র বিশেষ লইয়াই তাহার পরিতৃপ্তি হয় না। তবে আবশ্যক বোধে, কবি দণ্ড-পুরস্কারের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহাও অতি সন্তর্পণে,—অতি বিচক্ষণতার সহিত।—আবশ্যক বোধে কবি তখন সমাজের নেতা হন, এবং অন্য অপেক্ষা অল্পায়াসে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কারণ সমাজের উপর,—তথা মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ জন্য সৎ কাব্য পাঠে সমাজের যেমন হিত হয়, অসৎ কাব্যে আবার তেমনই অহিত সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং কবিকে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। তাঁহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। দেশাধিপতি বহিঃরাজ্য শাসন করেন, আর

কবি মানবের অন্তর্রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন!

যে কবি বা সাহিত্যকার এই গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিপথে চালিত হন, তিনি দেশের শত্রু,—সমাজের শত্রু,—সমগ্র মানব জাতির শত্রু।

কথাটার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তবে কথা এই, যাঁহারা লোক-শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থানুরোধে আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হন, তাঁহারা দেশের উপকার করিবার ব্যপদেশে, ঘোর অপকার করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহাদের অস্তিত্ব, সাহিত্য-জগতে অধিক দিন থাকে না। সম সাময়িক পত্র-সম্পাদকের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি পাইয়া, শীঘ্রই ইঁহারা অনন্ত-কাল-বুদ্বুদে লীন হন। সেই যা আশার কথা।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, "জগতের বুকে

যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন।”—জগতের বুকে লুকানো আছে কি? ব্যথা, দুঃখ, অবসাদ, কান্না, মর্ম্ম-কাতরতা,—এই সব। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন সুখের কোন ছবি কি সেখানে নাই? আছে।—কিন্তু তাহার স্মৃতি বড় অস্পষ্ট, বড় ক্ষীণ। সে ক্ষীণ সুখের আলোকে দুঃখের চিত্র আরও ঘনীভূত হয়। ঘোর নিশীথে, বিজন প্রান্তরে, আলেয়ার আলোর মত তাহা আরও ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কাঁদিতেই মানুষের জন্ম, কাঁদিয়াই মানুষের শেষ। এই অনন্ত দুঃখ-পারাবারে সুখের যে একটি ধ্রুব-তারা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা সেই ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমচ্ছায়া। সেই ছায়ার চলিত নাম ধর্ম্ম। প্রতিভাবান্ কবি, প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে, সেই ছায়ালোকে জীব ও জগৎ দেখিয়া লন এবং কাব্যচিত্রে তাহাই অঙ্কিত

করেন। তিনি দেখিয়া লন, পুত্র-শোকাতুরা জননী ক্রন্দন করিতেছেন,—তাহাতে কি অপূর্ব্ব কাব্য ফুটিতেছে! দেখিয়া লন, সতী মৃতপতি কোলে লইয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন,—তাঁহার মুখে কি গভীর মর্ম্ম-যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছে! দেখিয়া লন,—নীরব নিশীথে, বিজন অরণ্যে স্ফুটচন্দ্রালোকে নিরাশ-প্রাণ প্রণয়িনী এক হস্তে লতাপাশ কণ্ঠে দিয়া অন্য হস্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রেমের কি জীবন্ত অভিনয় করিতেছেন! দেখিয়া লন, সাগর-মিলনাকাঙ্ক্ষিণী স্রোতস্বিনী কেমন কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মনে চলিয়াছে! দেখিয়া লন, দুর্ভিক্ষে অগণিত বুবুক্ষু নরনারী জীর্ণ-শীর্ণ-কঙ্কালসার হইয়া কেমন ধীরে ধীরে মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া রাখিতেছে! মানস-নয়নে এই সব দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আর সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তাঁহার

আলেখ্য সম্পূর্ণ করেন। লীলাময়ী প্রকৃতি নীরবে এই যে সব নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে, কবি সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়াও, প্রতিনিয়তই তাহা মানসচক্ষে অবলোকন করিতেছেন,—আর কাব্যে ও সাহিত্যে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের সহানুভূতি আকর্ষণে সচেষ্ট হইতেছেন। অতএব দুঃখেই মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং এই মনুষ্যত্ব হইতেই সাহিত্যের উদ্ভব।

পক্ষান্তরে স্বর্গভ্রষ্ট সোনার শিশু সুধামাখা হাসি হাসিয়া জননীর কোল আলোকিত করিতেছে; শরতের চাঁদ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে, সুধাকিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে; নব দম্পতী সুস্মিত বদনে পরস্পরের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কত আশা মনে মনে গড়িতেছেন;—কি সুখের দৃশ্য! কে বলে সংসার দুঃখময়? কিন্তু হায়! মুহূর্ত্তের অভিনয়, মুহূর্ত্তেই শেষ। অকস্মাৎ ও কি হইল?

সহসা ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, সূচী-ভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে আকাশ-মেদিনী এক হইয়া গেল, মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল,—হায় হায়, ও কি হইল?—দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া আকাশের বজ্র নিম্নগামী হইল;—যে সুসজ্জিত কক্ষে, যে সুরম্য পালঙ্কে, এই পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে উল্লসিত নব-দম্পতী আশার স্বপ্ন বুকে লইয়া সংসারে নন্দন কাননের সৃষ্টি করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে, হায়!—সেই কাননের একটি ফুটন্ত ফুল বজ্রদগ্ধ হইয়া ঝলসিয়া পড়িল,—আর সেই সঙ্গে আর একটি অফুটন্ত বালিকা-জীবন চির অন্ধকারময় হইয়া গেল! আর ওদিকে, আর এক স্থানে, সেই যে সোনার শিশু, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া আঙ্গিনায় নাচিতে নাচিতে অস্ফুট ভাষায় কত খেলাই খেলিতেছিল,—ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে, সে গিয়া কুটীরে উঠিল;—ঝড়ের প্রাণে বুঝি ইহা সহিল না,—সে রাগিয়া—আরও

গর্জ্জিয়া সেই কুটীর খানি ভূমিসাৎ করিয়া দিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই মাকে জীবিত রাখিয়া, মায়ের জীবনের অধিক স্নেহের নিধিটিকে ছিনাইয়া লইল! অভাগিনী জননী শিহরিয়া দেখিলেন, এক খণ্ড বংশ তাঁহার বুকের নিধির বুক ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়াছে!—'যাদু আমার' বলিয়া জননী মূর্চ্ছিত হইলেন,—সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

কবি বলিতেছেন, "দেখ দেখি ভাই! আমি দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করি বলিয়া তুমি অনুযোগ কর; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কোন্ খান্-টায় আছে বল দেখি? 'সুখ' বলিয়া লোকে যাহাকে গ্রহণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সুখ নয়,—তাহা দুঃখেরই আর একটা দিক্। সুখ পাইবার আশায় লোকে সুখের অভিনয় করে মাত্র;—প্রকৃত সুখ পায় না। প্রকৃত সুখ সংসারে

নাই। যদি থাকে, তো এক ভগবৎ প্রেমে, আর আত্মবিসর্জ্জনে। এই আত্ম-বিসর্জ্জনেই মনুষ্যত্ব। আমি দুঃখের চিত্র দিয়া মনুষ্যত্বের প্রচার করি;—আমাকে না বুঝিয়া তুমি দোষ দাও!

"দেখ, অমন যে কুসুম, তাহাতে কীট আছে; অমন যে কমল, তাহাতে কণ্টক আছে; অমন যে চন্দ্র, তাহাতে কলঙ্ক আছে; অমন যে প্রণয়, তাহাতে বিচ্ছেদ আছে; আর অমন যে জীবন, তাহার পশ্চাতে মৃত্যুও আছে। এত সত্ত্বেও তুমি সংসারে সুখের আশা কর কি বলিয়া?"

এক হিসাবে এ সকল নিরাশা কাব্যের কথা।—'জগৎ দুঃখময়, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই,—মায়া নাই—মমতা নাই—দয়া নাই—বিচার নাই;—আমরা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি;—যত দিন বাঁচিয়া থাকি, কেবল দুঃখ ভোগ করি, তারপর

কাঁদিতে কাঁদিতে চির বিদায় গ্রহণ করি।—কোথায় যাই, কে বলিতে পারে? যদি জগদন্তর থাকে, তবে সেখানেও যে ইহাপেক্ষা দুঃখ নাই,—তাহাই বা কে বলিতে পারে?'—এইরূপ নিরাশার বাণী যে কাব্যের প্রাণ, তাহা নিরাশা কাব্য। আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, এই কাব্য-কার যাহা বলেন, তাহা ঠিক নয়। তবে আমার বিরোধ এই, তিনি কেবল একটা দিক দেখিয়াই সৃষ্টি-রহস্য বুঝিতে চান। মানব সাধারণতঃ অবস্থা ও ঘটনার দাস; প্রতিকূল ঘটনার স্রোত মানুষকে প্রায়ই ভাসাইয়া লইয়া চলে; যদি কেহ সেই অবস্থায় সহানুভূতি করিয়া সান্ত্বনা দেয়, তবে মানব-প্রাণ তাহারই দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নিরাশা কাব্যে অনেক সময় তাহা হয় না। এই জন্য এই শ্রেণীর কাব্যে জগতের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা কিছু অধিক। কেন না, প্রতিনিয়ত প্রতিকূল ঘটনার

আবর্ত্তে পড়িয়া মানবপ্রাণ উন্মত্ত হইবার সম্ভাবনা। তখন দিগ্বিদিক হারাইয়া, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী মানুষ—হয় আত্মঘাতী হয়, নয় জীবন্মৃত হইয়া সংসারে অভিশপ্ত দেহ-ভার বহন করে। সুখের বিষয়, আমাদের জাতীয় কাব্যের মূল উপাদান এরূপ নহে। তবে, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা ইহার মধ্যে যতই নিরাশার কথা আনি না কেন,—সেই নিরাশার মধ্যেও আমরা, একটুকু সুখের চিত্র না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের অস্থি মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে শুভ্র ফেনরাশির উদ্ভব হয়, যেমন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া মনোরম বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়—সেইরূপ নানা দুঃখ-অশান্তির ভিতর দিয়াও সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা কখনই ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে পারি না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, জীবনের এ হাহাকার,—হাহাকারেই

পর্য্যবসিত হইবে না ;—প্রাণের এ ক্রন্দন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে স্থান পাইতেছে। দুর্দ্দিনের অবসানে, আবার আমরা সুখের আলোক দেখিতে পাইব।

এই আশার বাণী কেবল সান্ত্বনা মাত্র নহে। কোন্ হিন্দু কেবলমাত্র ইহজীবনের সুখদুঃখে সম্যক্ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন ? কোন্ হিন্দু, সর্ব্ব-কর্ম্মের ভিতরও কোন অদৃশ্য অথচ স্পষ্ট অনুভবনীয় কালের পানে না তাকাইয়া থাকেন ? এই জন্য আমাদের কাব্যে, আমাদের সাহিত্যে, জগতের সার কথা আলোচিত হইয়া থাকে। অন্য দেশের কাব্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, তাহা আমাদের আদর্শেই অগ্রসর হইতেছে মাত্র। তবে আমরা যে নিরাশা কাব্যের প্রশ্রয় আজকাল এতটা দিয়া থাকি, তাহার কারণ, আমরা এখন কিছু আস্থা-হীন হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয়ের নির্ভর যেন ক্রমেই হারাইতেছি। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে,

আমরা কিছু আত্মপ্রিয়, আত্ম-সুখান্বেষী ও ইহ-কালসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছি!—তাই সুখান্বেষী হইয়াও সুখের আস্বাদ পাইতেছি না। এবং তাই কাতর প্রাণে হাহাকার করিতে করিতে মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছি ;—একরূপ আত্মঘাতী হইতেছি।

'সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে—আত্ম-বিসর্জ্জনে'—এ কথা অতি প্রাচীন। কিন্তু হায়, আজিও ইহা শিখিবার বিষয় ! আমরা এখন ইহ জীবনের সুখে এতই অন্ধ হইয়াছি যে, অনেক সময় কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া সুখের মাত্রা ঠিক করিতে যত্নপর হই। কাব্যের উচ্চ আদর্শ সেই জন্য এখন নামিয়া পড়িতেছে,—মনুষ্যত্বেও মানব সেই জন্য হীনতর হইতেছে। তাই এখন এ দেশে নিরাশা কাব্যের আদরও ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। আর্য্য সাহিত্যকারগণ বিবিধ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহার ভিতর

দিয়াও সুখের একটু অনাবিল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন ; একটু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। সে টুকু হিন্দু-সাহিত্য ছাড়া, আর কোথাও বড় মিলিবে না। আশার মধুর বাণী শুনাইতে, অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে, এমন কোন জাতি আর শুনায় নাই। এটি হিন্দুর নিজস্ব ; এটি হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, হিন্দুকে সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। অন্য দেশের কথা যাহাই হোক্, আমাদের এ দেশ যদি কখন আবার উঠে, তো সে এই ধর্ম্মভাবে। উঠিয়াছিলও এক দিন যাহা, তাহাও এই ধর্ম্মভাবে। সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। সাহিত্য ও মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে। কেন না, এই পন্থার অনুসরণ করাই প্রশস্ত।

তবু বলি, কান্না ভাল। বুকের অনেক উত্তাপ

অনেক কালি—ইহাতে ধুইয়া যায়। করুণতা জগতের প্রাণ, করুণরস কবিরও সর্ব্বস্ব। তাই না সেই আদি কবি—মহাকবির মুখনিঃসৃত করুণ-রস-পূর্ণ—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইতি শীর্ষক সেই আদি শ্লোক? মহাকবি মানস নেত্রে যেন মূর্ত্তি-মতী করুণাকে দেখিয়া চরাচর বিশ্বের ক্রন্দনের সুর সম্যক উপলব্ধি করিয়া, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, যেন এই প্রথম কান্না কাঁদিলেন এবং তারপর সেই সুরে অপূর্ব্ব রামচরিত লিখিয়া, জগৎকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিলেন!

"দেখ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জীবনের সেই প্রথম মুহূর্ত্তের সেই প্রথম কান্না, আর শেষদিনে বিদায়ের কালে সেই শেষ কান্না,—ভাল করিয়া ছকে মিলাইয়া দেখ, মধ্যকার ঘটনাগুলি যেন একটা দুর্জ্জেয় যাদুমন্ত্র! অথচ আবার একটু ভাল করিয়া দেখ, সেই একই সারি-গান,—সেই একই কান্নার সুর,—

সারাটা জীবন ব্যাপিয়া, তোমার হৃদয়ের উপর কি প্রবল আধিপত্য করিয়া গেল!

"সে দিন একখানা কাগজে পড়িতেছিলাম, একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—"মানুষ যে মরে, সে কেবল মরণ কামনা করে বলিয়া,—মৃত্যুর ভাবনা ভাবে বলিয়া;—নইলে মানুষ অমর হইতে পারিত।" কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্, ইহা ঠিক যে, মানুষ চিরদিন পুরাতন লইয়া থাকিতে ভাল বাসে না; এক-ঘেয়ে, একটানা জীবন ক্রমেই তাহার কাছে বড় বেশী ভারবহ বোধ হয়;—'নূতন দেখিব, নূতন পাইব,—মরণেই বুঝি সুখ,—এই রকম একটা ভাব বুঝি তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে, আর সেই অবস্থায় সে তখন আনমনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে থাকে,—"কোথা তুমি হে জীব-জীবন! কোথা তুমি, হে নিখিল-নির্ভর! কোথা তুমি, হে

মহাদর্শ! চিরদিন কি তোমায় আমায় প্রভেদ থাকিব? এ অভেদে প্রভেদ কি ঘুচিবে না? তোমার সহিত কি আমার মিলন হইবে না?"—এই রকম একটা কান্নার সুর, কখন জ্ঞাতসারে এবং কখন বা অজ্ঞাতসারে, মানুষের মর্ম্মস্থলে বাজিতে থাকে।—ইহাকে যা খুসী বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু কথাটা খুব খাঁটী।

"আর হাসি? যে হাসিতে সুধা ক্ষরে; যে হাসি দেখিয়া স্বর্গের কথা মনে পড়ে; যে হাসিতে অনাবিল, শুভ্র, শান্ত, পবিত্র হৃদয়-জ্যোতি ফুটিয়া উঠে;—ভগবদ্ভক্ত পরম প্রেমিক যে হাসির গুণে সেই রসরাজ, শ্রীরাসশেখর সচ্চিদানন্দের অপূর্ব্ব লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হন;—জীবন্মুক্ত পুরুষ যে হাসিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে একটা মায়ার খেলা ভাবিয়া সদানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন,—সেই স্বর্গীয় আসক্তি-হীন হাস্যও কি এই কবিতা হইতে উদ্ভূত নয়?"

কিন্তু এ হাসি হাসিতে পারে কয়জন? কাজে কবিকে মনুষ্য-প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার বুকের ব্যথা ও প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে হাসির কিরণ দেখাইয়া তৎপ্রতি তাহার প্রাণ-কেও আকৃষ্ট করিতে হয়।—কবির কাজ বড় শক্ত।

বিজ্ঞানালোকে কবিতা লোপ পাইবে? এ কথা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না! "এই অনন্ত জীবজন্তু-পরিপূরিত প্রাণি-জগৎ,—এই অসংখ্য নদ-নদী-সাগর-ভূধর-অরণ্যময় জল ও স্থল,—এই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাভরা উদার অনন্ত আকাশ,—এই অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার দিগন্তব্যাপিনী শস্য-শ্যামলা মেদিনী,—এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যত দিন ইহার স্থিতি, ততদিন কবিতারও স্থিতি। ইহাও ছাড়িয়া দাও,—একবার ভাই,

তোমার অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—তোমার অন্তর্নিহিত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—পক্ষান্তরে শোক, বিরহ মর্ম্ম-কাতরতা,—তোমার ধর্ম্ম, তোমার মনুষ্যত্ব,—কোন্ দিকে তুমি কবিতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে? মনে রাখিও, আকাশস্থ চন্দ্র এবং জননী ক্রোড়স্থ শিশু, চিরদিনই মধুর হাসিতে পৃথিবীকে হাস্যময়ী করিবে;—সে হাস্যোপভোগ কি, বিজ্ঞান মানব-মন হইতে বিলোপ করিতে সমর্থ হইবে?—যার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই এবং যার বাড়া আর শোক নাই,—সেই পরার্থে আত্মোৎসর্গ এবং শোকাতুরা জননীর মর্ম্মন্তুদ রোদন কি কস্মিন্‌কালে মানবের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে? না, বিজ্ঞানের অসীমশক্তি,—এই পরোপকার প্রবৃত্তি—এমন কি, পুত্রশোক অবধি ভুলাইয়া দিতে পারিবে? অপিচ, প্রধানতঃ এই শ্রেণীর সজীবভাব লইয়াই কবিতা। স্বীকার করি, বিজ্ঞান জড়জগতের উপর

খানিকটা আধিপত্য করিতে পারে বটে; পরন্তু মানবের হৃদয়ের উপর—তাহার কোমলতা ও কঠোরতার উপর তাহার অধিকার কতটুকু? কবিতাই এখানে জয়যুক্ত হয়।—কেন না, মানব-আত্মার মূলসূত্র কবিত্বে জড়িত। এই কবিতার অন্য নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মই পুত্রশোক ভুলাইয়া দিতে পারে, পরোপকারে প্রোৎসাহিত করিতে পারে, —বিজ্ঞান সে শক্তি ধারণা করিতেও অক্ষম।

এমত অবস্থায়, এই ভাবময়ী পৃথিবীতে বাস করিয়া,—কখন মহত্ত্বের উচ্চশিখরে উঠিয়া, কখন বা অবস্থাধীনে অবনতির গহ্বরে লুটিয়া, ভাবময়ী কবিতার অস্তিত্ব লোপের কল্পনাও তুমি করিতে পার না!

"তারপর ধর,—তোমার সমাজ, বৈষয়িক ব্যবহার, অর্থনীতি—শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদি;—বেশ কথা। কিন্তু ভাই! কবিতা ভিন্ন সর্ব্বাগ্রে কে তোমায় মানুষ করিবে? কে তোমায়

দয়া, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মোহন মন্ত্রে আহ্বান করিবে? এবং কেই বা তোমাকে প্রকৃত পুরুষ-সিংহের ন্যায় মহৎকার্য্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে অগ্রসর হইবে? অগ্রে তুমিই যদি না মানুষ হইলে, ত তোমার সমাজ, ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়—টিকিবে কি প্রকারে? তাই বলি, ভাই! প্রকৃত কবিতাকে পূজা কর এবং সেই গৌরবে তুমি গৌরবান্বিত হও। ছন্দোময় সুরলয়ে-গাঁথা কেতাবী কবিতা না পড়,—তোমাকে মনে মনে সেই বিশ্বেশ্বরের বিশাল কার্য্য-কবিতার,—পরিদৃশ্যমান্ এই অনন্ত বিশ্বের মহিমা;—ধ্যান করিতেই হইবে। নহিলে, ভাই! তুমি মানুষই থাকিবে না,—দেবত্ব লাভ ত-দূরের কথা!"

পরন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞান ও কাব্যে, মূলে বিশেষ বিরোধ নাই। আমরা স্থূল ভাবে যাহা দেখি, তাহাতেই বুঝি, যেন উভয়ে উভয়ের ছাড়া-

ছাড়ি।—'কবিই কেবল 'আদর্শ' লইয়া থাকেন—আর বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করেন।' একথা কিন্তু ঠিক নহে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকও অন্তরের অন্তরে কবি। তবে তাঁহার কাব্য-ভাব কিছু প্রচ্ছন্ন। সাধারণতঃ তিনি ধরা দেন না।—জড়-জগতের খুঁটীনাটী লইয়াই তিনি ধীরে ধীরে সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই মাত্র প্রভেদ।

পরন্তু কাব্যের উচ্চ আদর্শ প্রতিনিয়ত মানুষকে আহ্বান করিতেছে,—"এস তুমি, শ্রান্ত পথিক! জীবনের এ অনন্ত পথে, অনন্ত সুখ দুঃখ, তোমাকে লইয়া কত খেলাই খেলিতেছে—এস এস, দেখ কি অমূল্য উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি! তুমি কি সংসারে তুচ্ছ সুখ দুঃখ লইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে? এই দেখ, অনন্ত দুঃখ তোমার জন্য রাখিয়াছি,—এই দেখ, অনন্ত সুখও তোমার জন্য রাখিয়াছি!

অনন্ত কালের জন্য অনন্ত জীবন তুমি পাইয়াছ ;— অনন্ত সুখ দুঃখ ভিন্ন কি তুমি পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে ? এই দুঃখ দেখিয়া, শিহরিও না ; এই সুখ দেখিয়া, চঞ্চল হইও না। আত্মপর, ভেদা-ভেদ ভুলিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি—তিন মিলিয়া তোমার জীবন মধুময় করিবে,—তখন তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে !"

এই ভাবে যিনি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তিনিই প্রকৃত কবি। "তাঁহার সৃষ্টি,—সেই বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টির অন্যতম অংশ। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া, কবি নিজেও কৃতার্থ হন, আর জগৎকেও কৃতার্থ করেন।" সুতরাং কবিই প্রকৃত লোক-শিক্ষক, এবং কবিতার অনুশীলনই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এইরূপেই, সাহিত্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং মনুষ্যত্বে সাহিত্যে স্ফূর্ত্তি। মানুষ যত দিন মানুষ থাকিবে, তত দিন সাহিত্যের সমাদর করিবে,—এবং সাহিত্যের গৌরবে নিজেও গৌরবান্বিত হইবে।

২৩শে বৈশাখ, ১৩০৭।

সাহিত্যে ভাণ।

জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ—সরলতা ও আন্তরিকতার একান্ত প্রয়োজন। সরলতা আন্তরিকতা হীন জীবন যেমন সমাজের অপকারক, সরলতা ও আন্তরিকতা হীন সাহিত্যও তেমনি সাহিত্যের অপকারক। জীবনকে উন্নত করিতে হইলে যেমন সত্যের আশ্রয় লইতে হয়, সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলেও তেমনি সত্যাশ্রয় আবশ্যক করে। সৎজীবন, পৃথিবীর কল্যাণকর; সৎসাহিত্যও পৃথিবীর কল্যাণকর। সাহিত্য,—জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবন মলিন হইলে, জীবনের প্রতিবিম্ব—সাহিত্যও মলিন হইয়া থাকে।

এই মলিনতা কি? উত্তরে অনেক কথা আসে। তন্মধ্যে প্রথম কথা ও প্রধান কথা,—ভাণ।

ভাণ কি? যাহা তোমার নাই বা যাহা তুমি নও, তাহা দেখাইবার চেষ্টা—ছলনা। সুতরাং এই ভাণ,—সরলতা ও আন্তরিকতা বিবর্জ্জিত। সরলতা ও আন্তরিকতা বিবর্জ্জিত যে বস্তু, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ভাণও বর্জ্জনীয়;—জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ।

ভাণে জীবনকে অধোগামী করে; ভাণে সাহিত্যেরও অধোগতি হয়। তুমি বরং সরল সর্পট পাষণ্ড হও, অবস্থাবিশেষে তোমার পরিত্রাণ আছে, পরন্তু ভাণ বা কপটতার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া কস্মিন্‌কালে তুমি পরিত্রাণ পাইবে না। সাহিত্যও তেমনি;—তুমি বরং সরল-ভাবে সাদামঠা কথা লিখিয়া সাধারণ ভাব ও চিন্তা প্রচার করিও, এক শ্রেণীর পাঠকের

তাহাতে উপকার হইবে; পরন্তু যাহা তুমি জান না, যাহা তোমার জীবনে নাই, এবং যাহা তুমি কখন অনুভবও কর নাই, সেরূপ কথার আলোচনা করিয়া, মৌলিক তত্ত্ব প্রচার ব্যপদেশে একটা উদ্ভট সাহিত্যের সৃষ্টি করিও না। তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া মনে মনে হাসিবেন।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এই ভাগেরই একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। বিগত অষ্টাদশবর্ষকাল অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গসাহিত্যের সংশ্রবে থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের সাধের সাহিত্য ক্রমেই যেন অসার আত্মম্ভরিতার একটা পরিচয়স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। মনকে চোক ঠারিয়া, বাহিরে আমরা যত "উন্নতির" ধূয়া ধরি না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমের অবসান হইবার পর, আমাদের সাহিত্য উন্নত হয় নাই,—

সাহিত্যের কতকগুলা আবর্জ্জনা বাড়িয়াছে মাত্র। সংখ্যায় ও বিভাগে অনেক পুস্তক হইতেছে বটে; কিন্তু প্রকৃত সৎ-সাহিত্য অতি বিরল। সে বিরল এত যে, অঙ্গুলিতেও তাহার গণনা করা যায়। কথাটা তিক্ত হইলেও খাঁটী। একটু উদার চিত্তে এবং নিরপেক্ষ ভাবে কথাটার বিচার করিলে বাধিত হইব। বলা ভাল, এই প্রবন্ধ-লেখকও ঐ "আবর্জ্জনায়" বাদ পড়িতেছেন না,—কারণ লেখকের পুস্তকের সংখ্যা অনেকগুলি, এবং সম্ভবতঃ সেগুলিও উক্ত দোষ হইতে অধিক নির্ম্মুক্ত নহে।

যাহা সত্য ও সুন্দর,—যাহা সার ও শুভপ্রদ, তাহাই সাহিত্য। বুকে হাত দিয়া বল দেখি ভাই, এই চর্ব্বিতচর্ব্বণ কাব্য-উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে কয়খানা বাঙ্গলা গ্রন্থ উক্ত গুণ-বিশিষ্ট দেখিতে পাও? মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অনেক থাকিতে পারে; চটকপূর্ণ রোচক লেখাও

অনেকে লিখিয়া থাকিবেন; 'শেষ না করিয়া থাকা যায় না'—এমন গ্রন্থও অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে জানি; তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব,—স্থায়ী সাহিত্যে উহার স্থান নাই। বালক ও স্ত্রীলোকের কাছে,—চটকপ্রদ "রূপ-কথা" খুব রোচক, মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে; পরন্তু চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি কতকক্ষণ তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারেন? সুতরাং বলিতে হয়, চটকপূর্ণ বা রোচক এবং মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক হইলেই,—সাহিত্য ভাল হইল না,—সাহিত্যের উহা একটা মহাগুণও নয়। এ কথায় কেহ এমন না বুঝেন, আমরা "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" গোছের নীরস সাহিত্যের পোষকতা করিতেছি! সাহিত্য সরস হউক এবং সর্ব্বথা তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে; কিন্তু তা বলিয়া আলোচ্য বিষয়, কেবলমাত্র ভাষার ছটায় ও বর্ণনার ঘটায় ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহার স্বরূপ অপ্রকাশ রাখা

কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। ন্যায়, যুক্তি ও মূল কথা চাপা দিয়া, অবান্তর কথায় শাখা প্রশাখা বাড়াইলে,—তাহা আর হইল কি? ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া একটা জিনিসকে অনেক বড় করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে যে, আসল জিনিসই চাপা পড়ে! ক্ষুদ্র যূথিকার গুচ্ছের উপর যদি অঞ্জলি-পূর্ণ করবীর ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সেই যূথিকা আর সৌরভদানে সমর্থ হয়? রাশীকৃত করবীর দেখিয়া বালক মাতিতে পারে বটে; কিন্তু যে, ফুলের আঘ্রাণ বুঝিয়াছে, সে তাহাতে ভুলিবে কেন? সুতরাং বুঝা গেল, স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে, আপাত মনোহর চটকের হাত এড়াইতে হয়।

কেবল বাহবা পাইবার লোভে যে লেখে, তাহার না লেখাই ভাল। কারণ আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে ‘বাহবা’ জিনিসটা এখন এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা

দেখিয়া বিরলে অশ্রুপাত করেন। বরং অবস্থা বিশেষে 'বাহবা' না পাইয়া, যে দুর্নাম পায়, সেও বুঝি দেশের একটা কাজ করিয়া থাকে!

আমাদের কথা এই ;—যদি তুমি কিছু নূতন কথা বলিতে পার, তবে লিখ। যদি কোন নূতন আলোক, নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব তোমার আয়ত্তে থাকে, তবে তাহা লিপিবদ্ধ কর। যদি তুমি জগতে কোন সত্য প্রচারে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে 'লেখক' নাম ধারণে ধন্য ও কৃতার্থ হও। নহিলে ভাই, কেবলই সখ্ মিটাইবার, নাম কিনিবার ও বাহবা পাইবার লোভে, ও বোকা ভুলাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের মতলবে, সাহিত্যের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিও না। সাধনার যে ধন, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব লাভের যাহা প্রকৃষ্ট পথ, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির যাহা ভিত্তি-স্বরূপ, তাহাকে বণিক্-বৃত্তির অঙ্গীভূত করিও না। যাহাতে একাধারে আনন্দ, শিক্ষা, জীবনের তৃপ্তি

ও আত্মার স্ফূর্ত্তি, 'ভাবের ঘরে চুরি' করিয়া,—তাহাকে গোঁজামিল দিয়া যাইও না। যাহাতে মন প্রশস্ত হয়, বুকে বল বাড়ে, পরকে আপনার করা যায়, জগতের ও জীবনের অনেক দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়,—দোহাই ভাই! সে জিনিসটা লইয়া আর ন-কড়া ছ-কড়া করিও না। ইহাতে যে তুমি একা মজিবে তাহা নহে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুর্ভাগ্যও মজিবে। কিন্তু মনে রাখিও ভাই, সেই ফরাসী লেখকের সেই কাহিনী।

এখানে একটি গল্প মনে পড়িল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সম-সাময়িক এক লেখককে লক্ষ্য করিয়া জনৈক নীতিবেত্তা উপদেশচ্ছলে এই গল্পটি করিয়াছেন। গল্পটির মর্ম্ম এই;—এক ফরাসী লেখক বহু গ্রন্থ লিখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। পরলোকে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার পাপপুণ্যের বিচার হইল। বিচারে লেখক মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার ফলে উত্তপ্ত লৌহ কটাহে উষ্ণ তৈলে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করা হইল। লেখকের পার্শ্বে ঐরূপ তপ্ত তৈলে আর একটি জীবও দণ্ডভোগ করিতেছিল। সে, দস্যু। কিন্তু তাহাকে বেশ শুষ্ক ইন্ধনসাহায্যে ভাজা হইতেছে। আর লেখক মহাশয়ের

শিশু যেমন পুতুলের গায়ে রাংতা পরাইয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকে, এই শ্রেণীর লেখকগণ ঠিক সেইভাবে সাহিত্যকে প্রাণে মারিয়া, সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া, বাহ্যিক চাকচিক্যে মাতিয়া, আপনারাও প্রবঞ্চিত

ভাগ্যে কেবলই কাঁচা কাঠ পড়িয়াছে। তাহার ফলে তিনি ধিকি ধিকি করিয়া, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া সেই তপ্ত তৈলে পুড়িতেছেন। নিকটে রক্ষক দণ্ডায়মান। রক্ষককে দেখিয়া লেখক মহাশয় কাতরবচনে কহিলেন, "বাপু, এ তোমাদের রাজ্যের কিরূপ বিচার! ঐ দস্যু সারা জীবন পরের কাড়িয়া খাইয়াছে; কত লোককে প্রাণে মারিয়াছে; আর আমি গ্রন্থকার,—কত কষ্টে কয়েকখানা বই লিখিয়া কোন রকমে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি; তা ওর আর আমার এক বিচার হইল?—বাড়ার ভাগে ও'কে বেশ শুক্‌নো জ্বালানি কাঠ দিয়া জ্বাল দিবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, আর আমার ভাগ্যে যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ!—কেবলই ধোঁয়া, ধ'রেও ধরে না।—তপ্ত তেলে ঝল্‌সে পুড়িয়ে মার্‌বে, এতেও ইতর-বিশেষ কেন বাপু?" রক্ষক হাসিয়া উত্তর দিল,—"গ্রন্থকার মহাশয়! এমন সূক্ষ্মবুদ্ধি না হ'লে আর আপনি গ্রন্থকার হন? বলি ও তো ডাকাত, ওর মানুষ মারার তো একটা সংখ্যা আছে, কিন্তু আপনার কাণ্ডটা কি, একবার ভাবুন দেখি—জীয়ন্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোককে মারিয়াছেন, আবার মরণান্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধের বীজ পৃথিবীতে রাখিয়া আসিয়াছেন।—আপনার কেতাবের "জড়" তো শীঘ্র মরিতেছে না!"—পাঠক বুঝিবেন, তখন ফরাসী রাজ্যের

হয়, দেশকেও প্রবঞ্চিত করে। ইহারা আপনাদের নামের জয়ঢাক আপনি ঘাড়ে করিয়া বাজাইতে থাকে, কখন বা সমধর্ম্মা 'সাহিত্যিক' বন্ধুদ্বারাও একচোট বাজাইয়া লয়। বন্ধু যে বন্ধুকে বাড়ান, তাহার উদ্দেশ্য,—তিনিও সময়াস্তরে তাঁহার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ রামের বন্ধু শ্যাম,—রামের গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন;—আর শ্যামের বন্ধু রাম,—শ্যামের গ্রন্থ লইয়া দেশ মাতাইলেন। শুধু আদান প্রদান সম্বন্ধ,—স্বার্থ বিনিময়,—তাহার অধিক একটুও নয়। রামের দ্বারা শ্যামের যতটুকু স্বার্থসিদ্ধির

অবস্থা কিরূপ ভীষণ!—লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; পরকালে আস্থা নাই, পাপপুণ্যের ধারণা নাই; উচ্ছৃঙ্খলতায়, অরাজকতায় ও যথেচ্ছাচারিতায় তখন দেশ পূর্ণ; ভোগসুখ ও ইহকাল লইয়াই ফরাসী তখন দিশাহারা;—সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ের চিত্র, সত্য ও অভ্রান্ত স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া, উক্ত লেখক মহাশয়, লোকের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।—তাই বিধাতার বিধানে, লোকান্তরে তাঁহার এই দুর্গতি!

সম্ভাবনা আছে, শ্যাম ঠিক সেই পরিমাণে, তুলা-দণ্ডে চাপাইয়া, রামের প্রশংসার মাপ ঠিক করিলেন; রামও সুবিধা মত, নিক্তিতে ওজন করিয়া বন্ধুর সেই ঋণ পরিশোধ করিলেন! এই স্বার্থ-বিনিময় লইয়া, ঘটনা-সূত্রে যদি রাম ও শ্যামের মধ্যে একটু মনান্তর ঘটিল, তবে আবার তদ্দণ্ডেই রাম ও শ্যামের সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিবে। তখন আবার সেই রাম শ্যাম—সহস্র-মুখে পরস্পরের দোষ-কীর্ত্তনে ও নিন্দাবাদে রত হইবে। এবার শুধু গ্রন্থ লইয়া নহে,—গ্রন্থকারের পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক সমালোচনা চলিবে। যাঁহারা আজি কালের সাহিত্য-বাজারের সঠিক সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন, এ কথা এতটুকুও অতি-রঞ্জিত নহে। এ গেল, নিম্নস্তরের লেখকমণ্ডলীর কথা।

তারপর উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও এ গুণের অভাব

নাই! তাঁহাদের মধ্যেও দল আছে, দলাদলি আছে,—ঈর্ষা, পরচর্চ্চা, নিন্দা এবং ঘোঁটও আছে। সহজে ইঁহারা, প্রতিভাবান্ নবীন লেখককে আমল দেন না। তবে ইঁহারা নাকি অপেক্ষাকৃত চতুর ও বুদ্ধিমান,—সভ্যতার আবরণে ইঁহারা নাকি অনেক সময় আবৃত থাকেন, তাই ইঁহাদের প্রকট-মূর্ত্তি সহসা লোকে দেখিতে পায় না। বিশেষ, ইঁহারা নিজে হাতে কলমে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দেন না,—অনুগত শিষ্য সেবক বা অনুচর পারিষদ দ্বারা কাজ সারিয়া লন। ইঁহাদের প্রশংসার দুন্দুভিনাদ জন্য সংবাদ ও সাময়িক-পত্র-বিশেষ নিযুক্ত আছেন; স্থানে স্থানে বাঁধা দল আছে; সহরে নগরে সভা-সমিতিও আছে। সুতরাং সত্য কথা বলিতে গেলে, এ হিসাবে, ও নিম্নস্তর উচ্চস্তর দুই-ই সমান। অবশ্য, প্রকৃত শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সমসাময়িক পত্র-সম্পাদক ও পাঠকের

মতামত বড় গ্রাহ্য করেন না ;—সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা সাধারণ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করেন ;—নিন্দা বা প্রশংসা তাঁহাদের নিকট দুই সমান। তাঁহারা সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করেন ; সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন ;—অন্যপ্রকার লাভ-লোকসানের খতিয়ান তাঁহারা করেন না। সেই জন্য সাহিত্যে গোঁজামিল বা ভাণও তাঁহাদের নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

যিনি যে বিষয়ের অধিকারী, তিনি যদি সেই বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলে আর এ জঞ্জাল থাকে না। সে হিসাবে, যিনি আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত, মশা ও ছারপোকা-মারার দুটো ঔষধের কথাও গুছাইয়া লিখিতে পারেন, তিনিও সমাজের একটা কাজ করেন। তা নয়,—সকলেই যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা, ধর্ম্ম ও পরকাল-তত্ত্বের কথা, প্রণয় ও ভালবাসার কথা, 'শাদার পিঠে কালি' দিয়া বলিয়া যান, তবে লোকের তাহা ভাল লাগিবে কেন? সেই মামুলি মান্ধাতা আমলের অতি পুরাতন ও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বাঁধা-ধরা কথায়, কি এখন আর লোকের মন উঠিতে পারে? নূতন কথা, নূতন রকমে কিছু বলিতে পার,—সচ্ছন্দে বলিয়া যাও; লোকে কাণ পাতিয়া শুনিবে,—শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। সাহিত্যের সরস উদার প্রশস্ত ক্ষেত্রে,—স্বাধীনতার এ মুক্তরাজ্যে,—তোমার অবাধ অধিকার। পরন্তু তোমার যদি সে শক্তি ও সৌভাগ্য না থাকে, তবে কেন তুমি বৃথা প্রবঞ্চিত হও ও লোককে প্রবঞ্চিত কর?

আসল কথা,—"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" ইতি-শীর্ষক অমর কবির এই শ্লোকটিই,—এই শ্রেণীর লেখককে দিশাহারা করে। প্রধানতঃ যশের

লোভে, মানের মোহে ও নামের ইচ্ছায়—এই শ্রেণীর লেখকগণ লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু এই সঙ্গে একটু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব-জ্ঞান যদি ইঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে ঐ "নামের লোভ" বিশেষ নিন্দার জিনিস হইত না। দুর্ভাগ্য-বশত, এই শ্রেণীর লেখকদের সে কর্ত্তব্য বা দায়িত্বজ্ঞান এতটুকুও নাই। তারপর—সুদক্ষ ও সর্ব্বজনসম্মানিত সমালোচকেরও বড়ই অভাব। সে অভাবেও ইঁহারা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন না। না পারিয়া যা তা লিখেন,—আর, পল্লী-গ্রামের নিরীহ পাঠকমণ্ডলী তাহাই বিনা ওজরে পাঠ করিতে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি-প্রবৃত্তির দোষ আমি দিব না। লোক-শিক্ষকের পদে যিনি আসীন, তাঁহারই ত কর্ত্তব্য,—পাঠকের মনকে উন্নত করা? তা, সে কর্ত্তব্য এখন কয়জন পালন করিতেছেন? সাধু সুষ্ঠু স্বাধীন চিন্তা, গভীর

গম্ভীর ও পবিত্রভাব, উচ্চ ও স্বর্গীয় আদর্শ,—কয়জন এখন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট করিতেছেন? যাহাতে জাতীয় জীবন ও সমাজ গঠিত হয়, যাহাতে লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও লোকহিতৈষণাবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে বিমল সৌন্দর্য্যবোধ ও সত্যের ধারণাশক্তি জন্মে, যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে শিখে,—সেরূপ সার্ব্বজনীন উদার উন্নত ও উচ্চ আদর্শপূর্ণ সাহিত্য-গ্রন্থ এখন কয়খানা হইতেছে? হইলেও পত্রসম্পাদকগণের তাহা প্রচার করিবার নিঃস্বার্থ কামনা কোথায়? সাহিত্য-সমালোচক-গণেরও তাহা নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তিই বা কৈ? আমি মাত্র দুইটি লোকের নাম এখানে উল্লেখ করিব,—তাঁহাদের গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা, সহৃদয় পাঠক তাহার বিচার করিবেন। মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়কে আমি এখানে উল্লেখ

করিতেছি। বলুন দেখি, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, এবং চন্দ্রশেখরের বেদান্ত-সমালোচনা, পরলোকতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি অসাধারণ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থগুলি,—বাঙ্গলার কয়জন লোক পাঠ করিয়াছেন ? ভূদেবের প্রবন্ধেরও তবু কথা আছে ; কিন্তু চন্দ্রশেখর বসুর নাম পর্য্যন্তও অনেকে জানেন না। অথচ এই দুই জন অসাধারণ প্রতিভাশালী মনস্বী ব্যক্তি,—বাঙ্গলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে কি অমূল্য মণি-মাণিক্যই প্রদান করিয়াছেন! কৈ, ইঁহাদের গ্রন্থাবলী লইয়া—কোথায় তেমন নিরপেক্ষ ও উদার সমালোচনা ? ইঁহাদের গ্রন্থাবলী প্রচার উদ্দেশ্যে, কৈ, কোথায় পত্র-সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য-পালন ? অথচ এ হিসাবে, রামচাঁদের কবিতা-লহরীর কত অধিক প্রচার!—শ্যামচাঁদের উপন্যাস-মালার কিরূপ বিস্তৃত সমালোচন! কবি রামচাঁদের কাব্য-সমালোচন আর ফুরায় না,—ঔপন্যাসিক

শ্যামচাঁদের যশের জয়-ঢাক আর থামে না! তাই বলিতেছিলাম, পাঠকের রুচিপ্রবৃত্তির দোষ আমি দিব না। দোষ তাঁহাদের,—যাঁহারা কেবলমাত্র নামের খাতিরে বই লেখেন; দোষ তাঁহাদের,—যাঁহারা স্বার্থের খাতিরে সমালোচন করেন; আর ঘোরতর অপরাধ তাঁহাদের,—যাঁহারা প্রকৃত মানীকে উপেক্ষা করিয়া অমানীকে কোল দেন। পাঠকের দোষ কি? পাঠক তৈয়ারী করিবার শক্তি ত লেখকেরই হাতে।

এই গেল,—সাধারণ লেখক, পত্র-সম্পাদক ও সমালোচকদিগের কথা। ইহার উপর আর এক দল প্রবীণ সাহিত্য-সেবী,—সাহিত্যের কিছু অনিষ্ট করিতেছেন। যে কারণে হোক্, সমাজে ইঁহাদের একটু নাম-ডাক আছে, একটু পদ-মর্য্যাদা আছে,—সাহিত্য-বিষয়ক দুই এক খানি গ্রন্থেও ইঁহারা একটু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রসিদ্ধি ও প্রবীণতাই

ইঁহাদের কালস্বরূপ হইয়াছে। ইঁহারা যখন-তখন বড় বেশী রকমের বিজ্ঞতার ভাণ করেন; নব্য লেখকদের প্রতি অতিমাত্রায় মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকেন; আর এটা সেটা খুটীনাটী অছিলা ধরিয়া অভ্যুত্থানশীল লেখককে সদাই চাপা দিবার চেষ্টা করেন।—পাছে সেই লেখক, তাঁহার বহু-যত্ন-সঞ্চিত মানের মাপ অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয়! ইঁহারা কখন বৈয়াকরণ সাজেন; কখন ভাষা-তত্ত্ববিৎ হন; আর আবশ্যক বোধে কখন বা নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ হইয়া বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। ইহাঁদের যত ঝোঁক ও আক্রোশ,—কবিদের উপর। কবিরা আদর্শকে খাটো করিল, নীতি নষ্ট করিল, ধর্ম্ম আচার ও চরিত্রকে জাহান্নমে পাঠাইল,—ইহাই এই দলের ধূয়া। কবিদের কাব্য পড়িয়া ইঁহারা অতি সতর্কতার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া, এই সব

ভুল বাহির করেন,—আর তাহা লইয়া সমাজে, সাহিত্যে ও বৈঠকে দিবারাত্র জল্পনা করিতে থাকেন। প্রতিবাদ করিবার যো নাই,—তাঁহারা বয়সে প্রবীণ এবং সমাজেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত;—অধিকন্তু প্রতিবাদে তাঁহারা বড়ই চটিয়া যান। ইঁহাদের কটি বাঁধা গৎ ও চিরপ্রচলিত অতি পুরাতন নিয়ম-কানুন যিনি না মানিয়া চলিলেন, তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই। সেই অতি-সতর্ক বৃদ্ধ "পলোনিয়াস্"ও ইঁহাদের নিকট হারি মানেন। অথচ যে কারণেই হোক্,—ইঁহারা সাহিত্যের ও সমাজের অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছেন। আসল কথা,—ইহাঁদের যাহা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, তাহা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে, দুই একখানি গ্রন্থেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এখন বয়সের স্বধর্ম্মে ও অতিমাত্র বিজ্ঞতার ভাণে কোন নূতন চিন্তা বা ভাব ইঁহাদের মনে আর জাগে না;—তাই ধর্ম্ম ও নীতির

ধূয়া ধরিয়া, পবিত্রতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, সহজে আসর জমাইয়া, সাফ্ গোঁজামিলে ইঁহারা "সাহিত্য-জীবন" অতিবাহিত করিতেছেন, এবং তাহার ফলে, বিনা ওজরে, সাহিত্যেও রাশি রাশি ভাণ চালাইয়া যাইতেছেন! অবশ্য কবি-দের যে মূলে দোষ নাই এমন কথা বলি না;—কোন কোন কবির দোষ যথেষ্টই আছে এবং নানাকারণে থাকিবারও কথা;—তবে তাহা বলিবার ও বুঝাইবার পদ্ধতি ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। কতকটা ঈর্ষার জন্যও বটে, আর কতকটা বয়োধর্ম্মের বিচার-হীনতা-নিবন্ধনও বটে।

কিন্তু হায়! ইঁহাদের এই বিষম ভ্রান্তিতে সাহিত্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা দূরদর্শী চিন্তাশীল সাহিত্য-বান্ধবগণ সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিরলে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। এ অশ্রুপাতের কারণ,—সাহিত্যকে

তাঁহারা প্রাণের সমান ভালবাসেন। তাঁহারা জীবনে এবং ব্যবহারে বুঝিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিনা, জাতীয় জীবন কিছুতেই গঠিত হইতে পারে না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, রাজনীতি বাঙ্গালীর ধাতে সহে না; সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি খুব ভাল হইলেও তাহা সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। অগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি না হইলে, ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র, করিয়া—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই;—সেই সত্য সাহিত্যের অন্তস্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কেহ নাই;—সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপান। উচ্চে উঠিবার অগ্রে আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু ভাণে এ কাজ হয় না। সেই জন্যই প্রবন্ধের

মুখবন্ধে বলিয়াছি,—জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই,—ভাণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১৯শে ভাদ্র, ১৩০৬।

সংবাদপত্র ও থিয়েটার।

সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন—সংবাদপত্র ও থিয়েটার। জিনিস দুইটি খাস বিলাতী। আগে যাহা ছিল, তাহার কথা তুলিয়া ভারতের প্রাচীন-তত্ত্ব আবিষ্কার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে ঐ দুইটি বস্তু যে ভাবে আছে এবং যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গতি. ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং ফলাফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য।

বিলাতী সভ্যতার আলোকে যেমন আমরা অসংখ্য বস্তু লাভ করিয়াছি, তেমনই সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিস দুটিও পাইয়াছি। সাধারণ

লোক-শিক্ষার হিসাবে, এ দুইটি জিনিসই অমোঘ বলশালী। যাহার প্রভাবে, এক দিনেই সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে, তাহার শক্তি ও প্রভাব, বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাধারণতঃ, অল্প-শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় ও মন লইয়া জিনিস দুইটি গঠিত। এ কথায় কেহ এমন না মনে করেন যে, তবে বুঝি আমরা সংবাদপত্র ও থিয়েটারের পরিচালকগণকে প্রকারান্তরে 'অশিক্ষিত সমাজের নেতা' প্রতিপন্ন করিতেছি, এবং ঐ দুই বস্তুর রসাস্বাদনকারীগণকেও নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ সেরূপ প্রতিপন্ন করাও দূরে থাক্,—আমরা নিজেই এ দুই জিনিসের অনুরক্ত এবং ভক্ত। অশিক্ষিতের উপভোগ্য বলিয়া যে, সেই জিনিস সুশিক্ষিতেরও আদরণীয় হইবে না, এমন কোন অর্থ নাই। এই দেশে এবং প্রায় সকল দেশে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা

পণ্ডিতে ও মূর্খে সমান আগ্রহে উপভোগ করিতে পারে। এই সংবাদপত্র ও থিয়েটার হইতেও তাহা পারে। কারণ সংবাদপত্রেও ডিলানি ও ষ্টেড সাহেবের ন্যায় কৃতবিদ্য উদ্যমশীল শক্তিধর পুরুষ ছিলেন এবং আছেন, এবং থিয়েটারেও গ্যারিক ও আরভিংএর ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। এমত অবস্থায় ঐ দুই বিষয় বা বিষয়ের পরিচালক যে, সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে, আসল কথাটা হইতেছে এই যে,সংবাদ-পত্র ও থিয়েটার জিনিসটা প্রধানতঃ Mass বা "দল" লইয়া পরিচালিত। দলের রুচি অনুযায়ী সাময়িক আন্দোলন, হুজুগ, সংস্কার ও প্রবর্ত্তন,—প্রধানতঃ এই লইয়াই ঐ দুইটি জিনিস চলিয়া থাকে। সুতরাং অনেকটা আড়ম্বর ও দোকান-দারী ঐ জিনিস দুটায় করিতে হয়। না করিলে আসর জমে না, খরিদদার জুটে না। এদেশের

কথা দূরে যাউক, এই শিক্ষা-সভ্যতার পূর্ণ আধিপত্যকালে, খাস ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়ও ঐ অবস্থা। তবে, সেখানে ঐ ব্যবসাদারীর সঙ্গে সঙ্গে, লোক-হিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এখানে অনেক স্থলেই আদৌ তাহা নাই। নাই বলিয়াই আমাদের দুঃখ, এবং নাই বলিয়াই ঐ দুই বিষয়ের পরিচালকগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ অনুযোগ।

যাঁহারা দেশের ও দশের এবং তৎসাহিত আপনার কথা দিনান্তেও একবার ভাবেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, যে ভাবে আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাহার সহিত আবার সংবাদপত্র ও থিয়েটাররূপ প্রবল-শক্তি,—এ শক্তিও ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম রূপ,—মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ-শরীর (যে টুকু এখনও আছে) আলোড়িত

করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। তবে, কালের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ফলিতেছে এবং ফলিবেও। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে একেবারে স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। সমাজের অধঃস্তন সম্প্রদায় সর্ব্বকালে—সর্ব্ব সময়েই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের একটুখানি মাত্রও পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে; তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট-ভাবে থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা, এবং কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই, আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণের হৃদয় ও মন লইয়া সাধারণতঃ সংবাদপত্র ও থিয়েটার

পরিচালিত। সুতরাং সাধারণ যাহার প্রাণ-স্বরূপ, তাহার শক্তি ও প্রভাব অসীম। কারণ সাধারণ লইয়াই দেশ, সাধারণ লইয়াই সমাজ, সাধারণ লইয়াই ধর্ম্ম, সাধারণ লইয়াই সাহিত্য ও সাধারণ লইয়াই যা কিছু। সেই সাধারণের সহিত যাহার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে জিনিসের উচ্চ আদর্শ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে চাই; পরন্তু তাহার ব্যভিচার দেখিলে মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করি।

দুঃখের বিষয়, এই সাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদ-পত্র ও থিয়েটার ক্রমেই বড় অবনতির পথে যাই-তেছে। কথাটা উল্টাইয়া বলিলে ইহাই বলা হয় যে, সাধারণ লোকের মতি-গতি ক্রমশই বড় নিম্নগামী হইতেছে। সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ-স্বরূপ; সাধারণের প্রতিবিম্ব অনেক সময় সেই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া

থাকে। একজন বিদেশী পর্য্যটক কোন দেশে উপনীত হইয়া যদি সর্ব্বাগ্রে সেই দেশের সংবাদ-পত্র পাঠ করেন এবং থিয়েটার দেখেন, তবে তিনি স্বল্পায়াসে সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা ও মনের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ দেখিয়া যেমন সেই দেশের অভাব অনুযোগ উপলব্ধি হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়াও তেমনই সেই দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি প্রবৃত্তি এবং মানসিক গঠনও জানা গিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, থিয়েটার দেখিতে গিয়াও দেশের অবস্থা খানিকটা বুঝা যায়। সাধারণ লোক কি চায়, কি ভালবাসে, কোন্ রসের বেশী ভক্ত, তাহা সেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মুখের তৎকালীন ভাব দেখিয়া জানা যায়। আর জানা যায়, রঙ্গভূমির পরিচালক বা অধ্যক্ষের বিষয় নির্ব্বাচন দেখিয়া এবং অভিনীত অংশে নট নটীর অঙ্গ-

ভঙ্গী ও নেত্রবক্ত্র বিকারাদি দর্শন করিয়া। বলা বাহুল্য, শ্রোতা ও দর্শকের মনের ভাব বুঝিয়া অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ 'বাহবা'ই তাহাদের সম্বল; সমবেত দর্শক ও শ্রোতার তুষ্টি-সাধনই তাহাদের লক্ষ্য; আর রঙ্গমঞ্চের অধিকারী বা অধ্যক্ষের ইঙ্গিত-উপদেশ পালন করাই তাহাদের কার্য্য। তাহার বেশী তাহারা বড় একটা যায় না,—যাইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, দেশের অবস্থা এবং সাধারণের মতি গতি ও রুচি প্রবৃত্তি বুঝিতে হইলে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার দ্বারা তাহা স্বল্পায়াসে বুঝা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র ও থিয়েটারকে আমরা সমাজের দর্পণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা সমাজের দর্পণ এবং যাহার শক্তি ও প্রভাব অতি প্রবল, সে জিনিসের অধোগতি, দেখিলে স্বভাবতই মনে বড় কষ্ট হয়। আমাদের

দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের অবস্থা দেখিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি, এবং তৎপক্ষে দেশের সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তি-বৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাই-তেছি। বস্তুতঃ যিনি দিনান্তেও একবার আত্ম-সমাজ এবং সমাজরূপী আত্মপরিবারের মঙ্গলা-মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য চিন্তার সহিত এই দুই বিষয়ের চিন্তা করাও এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, দেখিতে দেখিতে সদরে অন্দরে প্রবেশলাভ করি-তেছে। সংবাদপত্রের ভাব ও চিন্তা, এখন অনে-কের নিত্য আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আপিসের স্বল্প বেতনভোগী কেরাণী হইতে মুদি-পাকারী পর্য্যন্ত এখন সংবাদপত্র পাঠ করে; সম্পাদকীয় আলোচ্য বিষয়ে বাদানুবাদ করে; কোন কোন 'পাবলিক্' বিষয়েও স্বাধীন ভাবে

মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আর মোটা মাহিনা-ওয়ালা মুৎসুদ্দি, সদরালা, ডেপুটী, মুন্‌সেফ, ইহাঁ-দের ত কথাই নাই ;—সকলেই এখন চা ও পান-তামাকের সহিত সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতা-মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুধু সহরে নহে, সুদূর মফস্বলেও এখন সংবাদপত্রের প্রভাব পরি-লক্ষিত হয়। আদালতেও দেখিবে, বিশ্রাম-মণ্ডপে বসিয়া, উকীল মোক্তার সংবাদপত্রের কথা কহিতেছেন। আবার অন্দরেও, নিতান্ত সে-কাল-ঘেঁসা স্ত্রীলোক ছাড়া, আধুনিক অনেক মহিলাও নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন,—দেশের সকল খবরই রাখেন। সুতরাং সংবাদ-পত্রের প্রভাব, কেবলই যে পুরুষ পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা নহে, অনেক পুর-মহিলা পাঠিকাও সংবাদপত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পক্ষান্তরে, থিয়েটারের প্রভাব ও আকর্ষণ,—

সংবাদপত্র হইতেও অনেকাংশে অধিক। সংবাদ-পত্রের কোন কোন বিষয় পাঠে একটু ভাবিতে হয়; তাহা আয়ত্ত করিতে একটু বেগও পাইতে হয়; পরন্তু থিয়েটারে একেবারে সমস্তই খোলা-খুলি। সেখানে হাবভাব বিলাসিতা ভরপুর; নৃত্য গীত সুপ্রচুর; সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট নয়নরঞ্জন; এবং আমোদ-উল্লাস চরম মাত্রায় বিদ্যমান। বিশেষ কোনরূপ প্যাণ্টমাইম্ বা কমিক্ অপেরা অথবা রঙ্গরসপূর্ণ প্রহসন হইলে ত আর কথাই নাই।—সে সময় আর আদৌ আব্রু থাকে না। নট নটীর মধ্যেও নয়,—বুঝি দর্শক-শ্রোতার মধ্যেও নয়! সকলেই তখন ভাবে ভোর;—হো হো হাসি, ঘন ঘন করতালি, আর রসাল বোলচালে রঙ্গমঞ্চ প্রকম্পিত হইতে থাকে।—সে সব দেখিয়া শুনিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিতে হয়; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়; অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে হয়।

অথচ, এই থিয়েটারই এখন সমাজের একটা দিক রাখিয়াছে। ইস্কুক স্কুলের ছাত্র হইতে, নাগাইদ অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ পর্য্যন্ত, এখন সমান আগ্রহে থিয়েটার দেখিয়া থাকেন। থিয়েটার-গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়।—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র,—শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সকল শ্রেণীর লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত পুর-মহিলা, থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। থিয়েটার-দেখা তাঁহাদের প্রায় ফাঁক যায় না। তাঁহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া মনে হয়, থিয়েটারের প্রভাব তাঁহাদের হৃদয়ের উপর বড় বেশী পরিমাণে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

কথাটা যখন পাড়িলাম, তখন একটু খুলিয়াই বলি। থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট আমার এক বন্ধু এক দিন আমায় বলিলেন, "মহাশয়, আর দেখেন কি? এখন ঘরে ঘরে সজীব থিয়েটার হইতে চলিল!—

সে দিন বেলা দুইটার সময় আমি একস্থানে যাই-তেছি, একটা গলির মধ্যে একটা বাড়ীর সাম্‌নে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ভদ্র পল্লী, গৃহস্থ বাড়ী।—দিব্য পরিষ্কার অভিনয়-স্বর, আমার কাণে গেল। অনুভবে বুঝিলাম, বামা কণ্ঠস্বর।—দুইটি স্ত্রীলোক নায়ক নায়িকা হইয়া, যথারীতি আমাদের থিয়েটারী-সুরে, আমাদেরই অভিনীত একখানি নাটকের কথোপকথন আবৃত্তি করিতে-ছেন। তারপর একজন মৃদুস্বরে যথানিয়মে গানও ধরিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। বোধ হয় বাড়ীর পুরুষেরা তখন আপিস-আদালত গিয়া থাকিবে; মেয়েরা সুযোগ বুঝিয়া গান ধরিয়াছেন।—এর চেয়ে জেনানা মিশনদের যীশু-ভজানো-ও যে ছিল ভাল, মহাশয়!”—কথাটা সত্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। কারণ, এই-রূপ এবং অন্যরূপ প্রমাণ আমি আরও পাইয়াছি, এবং স্থলবিশেষে তাহার কিছু কিছু প্রত্যক্ষও

করিয়াছি। তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীর, কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়াই যখন Hero ও Heroine সাজিতে সাধ যায়, তখন যে থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাদের মনে ঐ ভাবের আবির্ভাব হইবে এবং সুবিধা পাইলেই যে তাঁহারা ঐ অভিনয়ের একটু আধটু "কেরামৎ" দেখাইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্ব্বেকার মত ধর্ম্ম-শিক্ষা ত আর এখন নাই? কাজেই ধর্ম্ম-নীতি-বিবর্জ্জিত জীবনের যে ফল,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার কুদৃষ্টান্তে, আদর্শের অভাবে, তাহা ফলা অনিবার্য্য। ফল কথা, থিয়েটারে প্রলোভন ও আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব, এক হিসাবে সংবাদপত্র-পরিচালকের দায়িত্ব অপেক্ষাও অধিক। সংবাদপত্র-পরিচালক একটা 'ছক'—ভাষায় আঁকিয়া দেন; আর থিয়েটারের কর্ত্তা, সেই 'ছক' সজীবভাবে, দর্শক ও শ্রোতার হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

অথচ, এই থিয়েটার একবারে হেলাফেলার সামগ্রীও নহে। আমোদের সহিত লোকশিক্ষা দিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষ সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র-শিল্প—একাধারে এই তিনটি শ্রেষ্ঠ কলা বিদ্যাই থিয়েটারে বিদ্যমান। সুতরাং এ জিনিস যে উপেক্ষার জিনিস নয়, বুদ্ধিমান্‌কে সে কথা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পুথিগতবিদ্যায় তেমন অভ্যস্থ নহে; কিন্তু যাত্রা, থিয়েটার ও কথকতার উপদেশে অতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এখন, সময় শিক্ষা ও রুচিভেদে—যাত্রা ও কথকতা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে;—থিয়েটার তাহার স্থানে স্থায়ী আসন লইতেছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি, বিশেষ আবশ্যক।

থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইলে, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটু উদার ও উন্নত

প্রণালীতে থিয়েটার চালাইতে হইবে। তাঁহা-দিগকে ধীরে ধীরে এমন সব উচ্চ আদর্শ—লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে, যাহাতে লোকের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়; চরিত্র সুগঠিত হয়; এবং ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা অর্জ্জিত হইতে পারে। এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে একটু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; একটু পয়সার মায়া কাটাইতে হইবে;—একবার দেশের ও দশের পানে তাকা-ইয়া, সমাজের মঙ্গল স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সোপান উচ্চে উঠিতে হইবে। কারণ তাঁহারা যখন আনন্দ প্রদানের সঙ্গে লোক-শিক্ষ-কের আসন লইয়াছেন, তখন লোককে একটু উন্নত করিতে না পারিলে, আর কি হইল? বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের ন্যায়, রঙ্গ-সাহিত্যও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। দশটা সভা-সমিতিতে যা না হয়, এক খানি সুচিত্রিত সামা-জিক নক্‌সায় তাহা হইতে পারে। এইরূপ

সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের অভিনয়-ফল যে আরও উত্তম, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? ফল কথা, সৎকাব্যের প্রভাব কোন কালে নিষ্ফল হয় না। মহাকবি সেক্সপিয়রের রঙ্গ-সাহিত্য,—তাঁহার অদ্ভুত নাটকাবলী,—ইংরেজী সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছে, এবং সাহিত্যের পুষ্টির সহিত, ইংরেজ-সমাজেরও অনেক উন্নতি করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের রঙ্গালয়ের এখন শিশুকাল; এখানে অবশ্যই এখন সেক্সপিয়রের মহানাটকের ন্যায় রঙ্গ-সাহিত্যের আশা করিতে পারি না বটে; কিন্তু তা বলিয়া ছাই-ভস্ম যাহা ইচ্ছা তাহাই যে রচিত ও অভিনীত হইবে এবং তাহার ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবে, এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে পারি না। তদপেক্ষা যদি দেশ হইতে থিয়েটার একেবারে উঠিয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ।—দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল।

পরন্তু আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে অভিনয়ের

উপযোগী বহু বিষয় ত রহিয়াছে? রামায়ণ ও মহাভারত যে দেশের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ; রাম সীতা যে জাতির উপাস্য দেবতা; শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া পূজিত; সে দেশের এবং সে জাতির অভিনয়োপযোগী আদর্শ কাব্য বা নাটক, বড় বেশী খুঁজিতে হয় না। রামায়ণ মহাভারতের পুঁজি ফুরায়, বিশাল রাজস্থান রহিয়াছে;—তাহাই ভাঙ্গিয়া অভিনয় কর। তাহাও নিঃশেষিত হয়, উচ্চ ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ কর, এবং তাহাই সুকৌশলে ও নিপুণতাসহকারে জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া নাট্য-কাব্য রচনা করিতে থাকো। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে,—এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে,—পাশ্চাত্য শিক্ষার এই পূর্ণ আধিপত্য কালে—বাঙ্গালী-জীবনে বিলক্ষণ ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে,—এখন বঙ্গীয় সংসার বা সমাজ অবলম্বনে,—জাতীয় এবং বিজাতীয় ভাব

অবলম্বনে নাটক রচিত হইতে পারে।—যদি নিজেদের সে শক্তি ও সৌভাগ্য না থাকে,—তবে বঙ্গের কৃতবিদ্য শক্তিশালী সাহিত্য-সেবীগণকে আহ্বান কর ;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাও ;—নিজেদের অহমিকা ও দাম্ভিকতা একটু ত্যাগ করিয়া গুণের পূজা করিতে শিখ ;—নিশ্চয়ই উত্তম উত্তম নাটক বাহির হইবে; নিশ্চয়ই সৎ-গ্রন্থের অভিনয়ে দেশ এক সোপান উচ্চে উঠিবে।

তা নয়, যদি কেবলই কুৎসিত নাচগানের প্রলোভন দেখাইয়া এবং অশ্লীল প্যানূটমাইম্-প্রহসনের বুক্‌নি দিয়া, দেশকে রসাতলে দিতে চাও, ত আর কথা কি,—সাহিত্য, সমাজ, জাতীয়তা এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব,—এখন কিছু কালের জন্য চাপা পড়িল ;—আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতি স্বভাবসুলভ পঙ্কিল কুৎসিত আদি-রসে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী কাল হাবুডুবু খাইতে রহিল !

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ,—হিন্দুর পবিত্র

অন্তঃপুরেও, ধীরে ধীরে ঐ বিষের বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়,—অন্তঃপুর-চারিণী কুলমহিলাগণও তোমাদের রঙ্গালয়ে-অভিনীত কুৎসিত নাটক-প্রহসনের নায়ক নায়িকার অনুকরণে—এখন বেশ ভূষা এবং অঙ্গ-রাগাদি করিতেও অভিলাষিণী ;—তাঁহাদের হীনবুদ্ধি স্বামিগণও তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেছেন !—আমাদের অধঃপতনের আর বাকী কি ?

অথচ এই থিয়েটারের শক্তি এত অধিক যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।—এক দিনেই দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে। মনে পড়ে, "চৈতন্য-লীলা" "প্রহ্লাদ চরিত্র" "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া একদিন সমগ্র বঙ্গ মাতিয়া উঠিয়াছিল। দেশে ধর্ম্মেরও বেশ একটু সুবাতাস বহিয়াছিল। সহস্র উপদেশ এবং ধর্ম্ম-বক্তৃতায়ও যাহা হয় নাই, এক থিয়েটার হইতেই তাহা

হইয়াছিল। এখন বোধ হয় ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাই আর ভাল নাটক হইতেছে না, ভাল অভিনয়ও হইতেছে না। অভিনয়ের সে মর্ম্মস্পর্শী গভীর ভাব গিয়াছে; এখন কেবল কথার গাঁথুনি ও পট-পোষাকের বাহার আছে। বলা বাহুল্য, থিয়েটারের এই সংক্রামতা কেবল সহরের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত নহে,—সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহার টান্ গিয়াছে। অজ্ পাড়াগাঁয়েও এখন থিয়েটার হয়। সুতরাং সেখানেও এই থিয়েটারী ঢং, অল্পে অল্পে সদরে অন্দরে প্রবেশ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষ ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।

থিয়েটারের অবস্থা ত এই; আর সংবাদপত্রের? এদিকে চাহিলেও অন্ধকার দেখিতে হয়;—বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার জন্মে। যে সংবাদপত্র বিলাতে প্রবল রাজশক্তির পশ্চাদ্ধাবিত হয়; যে শক্তি সভ্যদেশের "চতুর্থ শক্তির" মধ্যে

গণ্য; যে দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদক সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া রাজার ন্যায় সম্মান পান,—তুলনা করাও দূরে থাক্,—সে দেশের ও সে জাতির 'আদর্শের' ধারণাও যেন আমাদের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। অথচ, আমরা সেই জাতির গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করি! মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর যা ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সংবাদপত্রেও ত তার ছায়া পড়িবে? স্বার্থত্যাগী ও সত্যসন্ধ হইতে না পারিলে সম্পাদকের আসন লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। একদিন এ মহাভাবের আভাষ একটু পাওয়া গিয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন অধিকাংশ সম্পাদকের মনের আর সে তেজ নাই, সে স্বাধীন ভাব নাই, সে উচ্চ লক্ষ্য নাই, সে সত্যপ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতা নাই,—কিসে কাগজ জমে, কিসে খরিদদার জুটে, কিসে হৈ চৈ পড়ে, কিসে নাম জাহির হয়, কেবলই সেই চেষ্টা ও মতলব।

ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালি, বৈরতা ও দলাদলি,—এখন কোন কোন কাগজের একমাত্র অঙ্গ। সাধারণ শিক্ষা ও লোকহিত কিরূপে হইবে; সমাজ ও দেশ কিরূপে উন্নত হইবে; দেশের অভাব ও অভিযোগ কোন্ উপায়ে প্রশমিত হইবে; প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি কিসে বর্দ্ধিত হইবে,—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ্যের মধ্যে আছে, কিসে পাঠকের মনোরঞ্জন হইবে,—কিসে নিজের দুই পয়সা লাভ হইবে,—আর কিসে গ্রাহক জুটিবে। অথচ ইঁহারই এখন লোক-শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত;—ইঁহারাই এখন দেশের "বড়লোক"!

যে বিলাতের আদর্শে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সংবাদপত্র ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত. সেখানে কি এই দুই প্রবল শক্তির এইরূপ অপব্যবহার হয়? বিলাতের লোকও ব্যবসাদার বটে; কিন্তু তাহারা জাতীয়তা ভুলে না,—দেশ ভুলে না,

সমাজ ভুলে না, মনুষ্যত্ব ভুলে না,—দেশের ও দশের উন্নতির জন্য তাঁহারা জীবন পণ করিয়া থাকেন।—তাহার সহিত আবার ব্যবসায়ও রক্ষা করেন। এই ব্যবসা-বুদ্ধি কি ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত জড়িত হয় না? স্বার্থ কি পরার্থের পূর্ব্ব-সূচনা নয়?

এমন দিনে সেই চিরস্মরণীয় "সোমপ্রকাশ" (পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত) নব-বিভাকর, সাধারণী এবং হরিশ্চন্দ্রের সেই "হিন্দু-পেট্রিয়টের" কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই কি দিন ছিল, আর এখন কি দিন আসিয়াছে! সেই সময়েই যেন দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে একটা "মাহেন্দ্র ক্ষণ" আসিয়াছিল। সে "ক্ষণ" এখন গিয়াছে,—যেন একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে! এখন এটা বিজ্ঞাপনের যুগ।

সত্যই বিজ্ঞাপনের যুগ! যার যত বিজ্ঞাপন, তার তত জয় জয়কার! ধর্ম্ম মানিবে না, মনুষ্যত্ব দেখিবে না, সমাজের পানে চাহিবে না,—যেন

তেন প্রকারেণ টাকা আসিলেই হইল! সর্ব্বত্রই কেবল—"টাকা, টাকা, টাকা"—রব। এই টাকার মোহেই সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান দুটি অঙ্গ, এখন একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত।

সংবাদপত্র ও থিয়েটার,—এই দুই প্রবল শক্তি ক্রমেই লোকের মন হইতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতেছে। সংবাদপত্রের সকল কথা এখন আর লোকে বিশ্বাস করে না। কাহারও সম্বন্ধে প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ হইলে, পাঠক স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ঐ লোকটার সঙ্গে এই কাগজ-ওয়ালার কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ বা মনোবিবাদ আছে। এইরূপে বিশ্বাস হারাইতে হারাইতে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব,—শেষে বিজ্ঞাপনেই পর্য্য-বসিত হইবে। আর ব্যক্তিগত কুৎসা, গালাগালি ও বেলেল্লাপনার আধিক্য দেখিয়া, লোকের সেই "রসরাজ" ও গুড়গুড়ে ভট্টচাজ্জির কথা মনে পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ স্বরূপ। যে দর্পণে বাঙ্গালী জীবনের এমন কুৎসিত প্রতিবিম্ব উঠে, সে দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। সে দর্পণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া, অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া থাকাই প্রশস্ত।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

হিন্দুর আদর্শসাহিত্য।

'আদর্শ' কথাটা লইয়া অনেক স্থলে অনেক-বার অনেক কথা বলিয়াছি ; এখানেও দুই এক কথা বলার আবশ্যক হইতেছে। যাহা আছে, কিন্তু বড় প্রচ্ছন্ন ; যাহার সত্বা আমরা হৃদয়ে অনুভব করি, কিন্তু জীবনে ও ব্যবহারে বড় একটা খুঁজিয়া পাই না ; যাহা পাইবার অভিলাষে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আমরা জীবন-পথে একটু একটু অগ্রসর হইতেছি ; যে মহাবস্তু লাভের জন্য—কবির কল্পনা, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান—আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; যে অমূল্য নিধির অনুসন্ধানে, সাধক যোগী ও তত্ত্বজ্ঞানী প্রাণপাত

করিতেও কুণ্ঠিত হন না,—সেই অপার্থিক অলৌকিক অপূর্ব্ব সত্যই—"আদর্শ"। সমষ্টি ভাবে বুঝিতে গেলে, 'আদর্শ' অর্থে আমরা ইহাই বুঝি। এই সমষ্টিকে ব্যষ্টিতে পরিণত করিয়া, লোকে প্রয়োজনানুসারে 'আদর্শের' ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া থাকে।

সত্য—অনন্ত রত্নের আকর, অনন্ত তত্ত্বে পরিপূর্ণ। সত্য—সৌন্দর্য্যময় ও মাধুর্য্যপূর্ণ। যাহাতে একাধারে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশ, তাহা চিরদিন জগৎকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তুমি যত বড় 'পতিত' ও পাষণ্ড হও না কেন, সত্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতে কিছুতেই আপনাকে অব্যাহত রাখিতে পারিবে না। সেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের অধীশ্বর, কৃপা করিয়া, একদিন-না-একদিন, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিবেন; আর তুমিও একদিন-না-একদিন, সেই সত্যেশ্বরের শান্ত-শীতল চরণে শরণ লইয়া

মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিবে। কর্ম্ম-ফেরে যদি ইহজন্মেও তোমার পরিত্রাণ না হয়, ত জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তোমার দুষ্কৃতির বিলয় হইবে। এত দয়া না হইলে, সেই অনন্ত দয়াময় কখনই তোমাকে বা আমাকে মনুষ্য-জন্ম দিতেন না।

তা, সত্য হইতেই যখন 'আদর্শের' উদ্ভব, তখন আদর্শও সত্যময়। আদর্শের আসল অর্থ,—মূল লিপি, অর্থাৎ যাহা দেখিয়া লেখা যায়। সেই 'মূল লিপি'কে এখন আমরা বহু অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কাহারও চরিত্রের প্রশংসা করিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি,—'আদর্শ চরিত্র'। কাহারও বন্ধুত্বের গুণবাদ করিতে হইলে বলি,—অমুক লোকটা 'আদর্শ বন্ধু'। এইরূপ যত কিছু সদ্‌গুণের উৎকর্ষ, তাহাই 'আদর্শ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপিচ, ইহাতে প্রকারান্তরে, সেই মূল অর্থেরই সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়।—'যাহা

দেখিয়া লেখা যায়' অর্থাৎ যাহার অনুকরণ করা যায়, তাহাই আদর্শ। বলা বাহুল্য, অসদ্বস্তু অনুকরণীয় নহে, সুতরাং তাহাকে 'আদর্শ' বলা যাইতে পারে না।

অন্যান্য সকল বিষয়ের যেমন আদর্শ আছে, সাহিত্যেরও তেমনই আদর্শ আছে। সৎ সাহিত্যই—সাহিত্যের আদর্শ। সৎসাহিত্য বলিতে আমরা ইহাই বুঝিব যে,—যাহা জীব ও জগতের কল্যাণকর, যাহা শুভপ্রদ, যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহার ধারণায় মন বিশাল ও তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম হয়; যাহার অনুশীলনে বুকে বল বাড়ে; যাহার আলোচনায়—"জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—এই মহানীতি শিক্ষা করা যায়, তাহাই সৎসাহিত্য। সৎসাহিত্যের লক্ষ্য,—জীব, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়। অর্থাৎ জীবের সহিত জগতের, এবং জগতের সহিত জগদীশ্বরের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া

তদনুসারে সংসার-পথে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত করণ।—এত বড় মহালক্ষ্য যাহার, এবং এত শক্তি যাহাতে, তাহাকেই আমি আদর্শ-সাহিত্য বলি।

হিন্দুর জীবনে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যে, রামায়ণ এবং মহাভারতই এই আদর্শ সাহিত্য। এই দুই বিশাল গ্রন্থে, যে সকল অমূল্য মহারত্ন নিহিত আছে, তাহা হিন্দুর নিজস্ব;—খাঁটি পৈত্রিক ধন। হিন্দুকে আবার হিন্দু হইতে হইলে, ঐ রামায়ণ মহাভারতেরই আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ দুই মহা মহীরুহের ছায়াতলে বসিয়া, হিন্দুর চরিত্র ও জীবন গঠিত করিতে হইবে। ঐ দুই মহাগ্রন্থ কেবল জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছে যে—'পরার্থে আত্মোৎসর্গ কর—পরসেবাই ধর্ম্ম; ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করে; সুতরাং ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু, এবং ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়।' রামায়ণ মহাভারত যুগ-যুগান্তর হইতে জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছে,—

'সকলকে ভালবাসিতে শিখ, কাহাকেও পর ভাবিও না ; সুখে দুঃখে অবিচলিতভাবে ভগবানে নির্ভর করিও ; মনে রাখিও—সুখ ভোগে নয়,—সুখ ত্যাগে।' এমনই অমৃতময়ী বাণী যে সাহিত্যের অক্ষরে অক্ষরে নিহিত, তাহাকেই আমি আদর্শসাহিত্য বলি, এবং বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবিগণকে, সর্ব্বথা, এই মহাসাহিত্যের আদর্শে, বঙ্গ-ভাষার পরিপুষ্টি করিতে পরামর্শ দিই।

অবশ্য, রাজা এখন আমাদের ইংরেজ ; সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যের ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করা, এখন আমাদের অপরিহার্য্য ; পরন্তু সেই ভাব ও চিন্তা আমাদিগকে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের জাতীয় ভাব, জাতীয় নীতি, জাতীয় আচার-পদ্ধতি,—ম্লান ও মলিন হইয়া না যায়। অতি সতর্কতার সহিত, বিশেষ নিপুণতা সহকারে, আমাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। নচেৎ, আমাদের

জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব, অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইবে। তখন আর সহস্র চেষ্টায়ও তাহার গতিরোধ করা যাইবে না। সম্প্রদায় বিশেষে ইহারই মধ্যে, সে লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই হেতু আমাদের সবিনয় নিবেদন, যাঁহারা সর্ব্বদাই ইউরোপীয় সাহিত্য লইয়া বড় বেশী নাড়া-চাড়া করেন, এবং তাহার কোন কোন ভাব ও চিন্তা—সরস বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন,তাঁহারা হিন্দুজীবনের বিশেষত্ব স্মরণ করিয়া এবং স্বজাতির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী পরিচালিত করি-বেন। কেন না,যে জাতির আমরণ কাল—সকল কর্ম্মই—ধর্ম্মের সহিত জড়িত ; রামায়ণ ও মহা-ভারত যে জাতির আদর্শ সাহিত্য-গ্রন্থ, রাম সীতা যে জাতির উপাস্য দেবতা ; শ্রীকৃষ্ণ যে জাতির পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ; সে জাতিকে টিণ্ডেল, হাক্সলি, মিল্, স্পেন্সার, রুসো, ভল্টেয়ার প্রভৃতি

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে দীক্ষিত করিতে যাওয়া শুধু যে অকর্ত্তব্য তাহা নহে, তাহাতে ঘোর প্রত্যবায় আছে। বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকেও এ বিষয়ে একটু সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। —তাঁহারাও যেন অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া, এই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন,—যা তা পড়িয়া সহসা কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। এই বিপত্তির হাত এড়াইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, অগ্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে,—গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এবং মুখবন্ধে, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লিখিত হইত। অর্থাৎ গ্রন্থকার নাস্তিক হইলে, তাঁহার গ্রন্থ কেহ পাঠ করিতেন না,—পাঠ করা অবৈধ মনে করিতেন। কথাটা শুনিতে হঠাৎ খুব "অনুদার" ও "সঙ্কীর্ণ" বোধ হয় বটে; কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে বুঝা যায় যে, কথাটা বড় খাঁটী।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বড় নিরাশ হইতে হয়। কেন না, এখনকার অধিকাংশ লেখকের মতের ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোন স্থিরতা নাই; কোন একটা বিশেষ লক্ষ্য নাই; লোক-হিতের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই।—লোক উৎসন্ন যায় যাউক; সমাজ ভাঙ্গিয়া যায় যাউক; লোকের মতিগতি নিম্নগামী হয় হউক;—তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই হইল। এমন দিনে, প্রকৃত সৎসাহিত্যের আদর্শ—হিন্দুর রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ—অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। রামায়ণ ও মহাভারত,—মনুষ্যজীবনের গূঢ় ইতিহাস; অন্ত-প্র্কৃতির বিমল দর্পণ; ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।—সুতরাং ইহা "সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন।"—এই উচ্চ আদর্শ যে সাহিত্যে আছে, তাহাকেই আমি হিন্দু জীবনের আদর্শ সাহিত্য বলি, এবং আজিকার দিনে তাহার বহুল প্রচার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

পরন্তু এই 'আদর্শ' চিরদিন এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করে। একটু স্বাতন্ত্র্য, একটু পার্থক্য, একটু বিশেষত্ব—তাহার ধর্ম্ম। যেখানে দেখিবে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে ; সেখানে বুঝিবে, প্রকৃত 'আদর্শ' নাই। সর্ব্বদেশের—সর্ব্ব-কালের সাধারণ লোক, চিরদিনই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে ; সুতরাং 'আদর্শের' ধারণা, প্রথমতঃ অধিকাংশের পক্ষেই একরূপ অসম্ভব হয়। শেষে কোন শক্তিধর পুরুষ, সেই আদর্শের সত্ত্বা, প্রকৃষ্ট প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, লোকে ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বভাবের ধর্ম্মই এই। সেক্সপিয়র 'হামলেট' লিখিলেন ; আর একজন 'দ্বিতীয় সেক্সপিয়র' না হইলে,সে 'হামলেট' বুঝায় কে? তাই গেটের ন্যায় লোক আসরে নামিলেন ;—'হামলেট' কি, গেটে বুঝাইয়া দিলেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এখন সমালোচকের

অভাব। প্রকৃত সমালোচক এখন নাই। অথবা থাকিলেও, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লোকে এখন পাইতেছে না। প্রথম কিছু দিন বঙ্কিম এ পরিচয় দিয়াছিলেন। তার পর যে দুই এক জন একটু আধটু দিয়াছিলেন, তাহা সেই বঙ্কিমেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। এখন হায়! সেই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও নাই।

সাহিত্যের সমালোচক নাই; সুতরাং হিন্দুর আদর্শসাহিত্যের পরিচয় লয় কে? পরিচয় লইলেও, তাঁহাকে মানে কে? মানিলেও, সেই মত কার্য্য করে কে? কে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, অশ্রান্ত শ্রমে লোকের মতিগতি ফিরাইতে তৎপর হইবে? কে পরার্থে আত্মত্যাগ করিয়া দেশের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইবে? কে সাময়িক সুখ্যাতি, মান ও অর্থের মায়া কাটাইয়া, লোকহিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিবে? সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান উপায়—

সংবাদপত্র ও থিয়েটার। কিন্তু আজি কালি এই দুইটি প্রবল শক্তির এতদূর অপব্যবহার হইতেছে যে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সংবাদ অবগত হইলে, প্রকৃত দেশহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সাধারণ লোকশিক্ষার ভার আর গ্রহণ করে কে? সাধারণকে উন্নত ও সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে,—পক্ষান্তরে সাধারণকে উত্তরোত্তর অধঃপাতে ও নিম্নস্তরে লইয়া যাইবার প্রলোভন দেখাইলে,—ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা কিছুই থাকে না। ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা না থাকিলে, সাহিত্যও টিকিতে পারে না। পরন্তু সৎ-সাহিত্যই এই সকল বিষয়ের পরিপোষক। সুতরাং সৎ সাহিত্যকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষণ ও পোষণ করা, প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের অভাবে, সে কর্ত্তব্য এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে।

তাই এই ঝুটার বাজারে, সাচ্চা আর এখন স্থান পাইতেছে না। তাই, আদর্শ সাহিত্য অনাদৃত হইয়া, সাময়িক চটক্‌পূর্ণ সাহিত্য এক্ষণে গৌরবান্বিত হইতেছে। তাই চিন্তাপূর্ণ মৌলিক তত্ত্বগ্রন্থের পরিবর্ত্তে, বাজে নাটক-নভেল প্রহসন-আখ্যান এখন হু-হু বাড়িয়া যাইতেছে। সময়-গুণে, শুভলগ্নে, দিনকত সাহিত্যের স্রোত একটু ফিরিয়াছিল; দিনকত লোকের মতিগতি একটু ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল; কিন্তু এখন আবার যে-সেই।—বুঝি, রসরাজ ও গুড়গুড়ে ভট্‌চায্যির প্রেতাত্মা, পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, দ্বিগুণ প্রতাপে সমাজ-শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! সংবাদ-পত্রে দেখ, ব্যক্তিগত কুৎসা ও পরগ্লানি; থিয়েটারে দেখ, উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে "ঝুমুরওয়ালীর" নাচ। অথচ, এই দুই প্রবল শক্তি, ইচ্ছা করিলে, সহজে লোকের মতিগতি ঊর্দ্ধে উঠাইতে পারেন। বলিয়াছি ত,

সর্ব্বাপেক্ষা অভাব—সমালোচকের। প্রকৃত শক্তি-শালী সম্ভ্রান্ত সমালোচক না থাকায়, সাহিত্যে ও সমাজ-শরীরে এই বিষ প্রবেশ করিতেছে; এবং তাহার ফলে, আদর্শমূলক সৎসাহিত্যও ক্রমশই লোপ পাইতেছে।

এ দুর্দ্দিনে, প্রকৃতই আনন্দ ও আশার কথা যে, অন্ততঃ দুই চারি জনও, সাময়িক সুখ্যাতি ও নিন্দা এ উভয়কেই পদতলে দলিত করিয়া, আপন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন। তবে তাঁহাদের লেখা কেহ বড় একটা পড়ে না; সে সব রত্ন, কেহ দেখিয়াও দেখে না;—সুতরাং তাহার প্রচারও তাদৃশ হইতেছে না। গিল্টির বাজারে, সস্তা দরে, কেবল কেমিকেলই বিকাই-তেছে;—খাঁটি সোনা কেহ ছোঁয় না। 'কেমি-কেল' পাইয়াই লোক ভুলিতেছে; খাঁটী সোনা উপেক্ষিত না হইবে কেন? দেশের এ দুর্দ্দিনে, যিনি প্রকৃত সুহৃৎ, তাঁহার উচিত, লোকের চক্ষু-

কর্ণ ফুটাইয়া দেওয়া। কিন্তু হায়, কাল-মাহাত্ম্যে, সে ধর্ম্মটুকুও কেহ রাখিতেছেন না ; পাছে তাঁহাদের আপন আপন ব্যবসায়ের অনিষ্ট হয়,—পশার কমিয়া যায়! সাহিত্য, এখন যেন সত্য সত্যই বণিক্-বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা সমালোচক নহি। সমালোচনা করিবার শক্তি এবং সময়ও আমাদের নাই। তবে দেশের যে অবস্থা, লোকের উপস্থিত মতিগতি যেরূপ, তাহার একটুখানি পরিচয় দিয়া রাখিলাম মাত্র। আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে, যাঁহারা প্রকৃতই শক্তিশালী ও লোকহিতেচ্ছু, তাঁহারা স্বজাতির এই দুর্গতি স্মরণ করিয়া, প্রকৃষ্ট প্রণালীতে লেখনী পরিচালিত করিবেন। কেহ পড়ুক আর নাই পড়ুক,—তাঁহারা যেন সত্য ও সৌন্দর্য্যপ্রচারে কৃপণ না হন। ইহা আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। কেন না, একটা আশার কথা এই যে,—'কাল অসীম এবং পৃথিবী বিপুলা।—

আজ এখানে যাহা হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি, কাল স্থানান্তরে যে তাহা না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?'

বিশেষ প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ জীবিত কালে সম্যক্ মর্য্যাদা পান না—ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষগণ, সাধারণতঃ একটু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ এবং কার্য্য-মহিমা, সাধারণতঃ একটু প্রহেলিকা-ময়। প্রকৃত গুণগ্রাহী গুণবান্ ভিন্ন তাঁহাদিগকে কেহ ধারণা করিতে পারে না।—তাই জীবিত-কালে তাঁহাদের সম্যক্ মর্য্যাদা হয় না, এবং তাঁহাদের সংবাদ অতি অল্প লোকেই রাখে।—পরন্তু ইহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। সাধারণ লোক যদি অসাধারণকে উপস্থিত মুহূর্ত্তে চিনিল, তবে সেই অসাধারণ ব্যক্তির বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্যটি কি ? আমার বোধ হয়, প্রকৃত গুণবান্‌কে শ্রে-

অজ্ঞ ও নির্ব্বোধেরা সাধারণতঃ উপেক্ষা করে,—সেই উপেক্ষাটিই গুণবানের পক্ষে প্রকৃত গৌরব, এবং তাহাদের প্রশংসাটিই তাঁহার পক্ষে সত্য সত্যই অগৌরব। সেক্সপিয়র যে, তাঁহার সাম সময়িক লোকদের নিকট প্রকৃষ্টরূপে সম্মান ও মর্য্যাদা পান নাই, সেইটিই মহাকবির পক্ষে প্রকৃত গৌরবের কথা এবং সেইটিই তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরূপে দীপ্যমান্। সেই হিসাবেও সাহস করিয়া বলিতে পারি, যিনি হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন স্মরণ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যে হিন্দুসন্তানকে এক সোপান উচ্চে তুলিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল বলিয়া, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট পূজা পাইবেন। কেন না, বিধাতার এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, সাধুতা ও সদিচ্ছার ফল, কখনই বৃথায় যায় না। হিন্দুকে আবার হিন্দু হইতে হইলে,

হিন্দুর আদর্শসাহিত্যের সম্যক্ অনুশীলন করিতে হইবে। প্রচুর আন্তরিকতা ও যথোচিত শক্তি থাকিলে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিতর দিয়াও তাহা করা যায়। কেন না, সকল দেশের—সকল সমাজের—সকল সাহিত্যের—অথবা সাহিত্যরূপী ধর্ম্মের—সেই শেষকথা এবং মূলকথা এক—

"জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"

শ্রাবণ, ১৩০৭।

মেঘদূত।

বৈকাল হইতে মেঘে আকাশখানা ঢাকিয়া রাখিয়াছে; মধ্যে কিছু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই, চুপ্ চাপ বসিয়া আছি। গৃহিণী আজ কয়দিন অত্যন্ত বিরক্তি আরম্ভ করিয়াছেন, কিছু দিনের জন্ম তাঁহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে হইবে। কোন কারণ নাই, হঠাৎ 'সক্' হইল—বাপের বাড়ী যাইব। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহাকে পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। আমি অনেক করিয়া বুঝাইলাম, কিন্তু সে কথা শুনে

* মহাকবি কালিদাস প্রণীত "মেঘদূতের" সমালোচন।—এই প্রবন্ধটি আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর লিখিত।

কে? যখন রাগ করিলাম, গৃহিণী বড় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ভীত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব যে মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন-সর্ব্বস্ব সতীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজি আমিও যেন সেই মূর্ত্তি দেখিলাম! তখন অগত্যা পাঠাইতে মত্ দিতে হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা তুমি এ সময় যাইতে চাও কেন?" গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি যাইতে দিবে না কেন, আগে তাই বল।" আমি বলিলাম,—"দেখ, তোমাকে এক দিন না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। এমন বর্ষার দিনে, তুমি বাপের বাড়ী যাইবে, আর আমি এ ঘোর বর্ষা-বিরহ কেমন করিয়া সহিব?"

তখন অভিমানিনী, অঞ্চল খানি টানিয়া, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"কেন, সে দিন যে বলিতেছিলে,—

'বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে,
মিলন-দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে—'

তা এ 'মিলন-দাবানলে' পুড়িয়া কাজ কি? দুই দিন একটু অন্তরে থাকি না কেন,—দাবানল নিবিয়া আসিবে।"

মনে মনে কবিতার কপালে আগুন জ্বালিয়া দিলাম।—"মিলন দাবানল।" দাবানল নিবিয়া কাজ নাই, পুড়িয়া মরি—সেও ভাল।

গৃহিণী রাগের ভাণ করিয়া কাছ হইতে উঠিয়া গেলেন। গতিক ভাল নয় দেখিয়া, পিছন হইতে আমি তাঁহার অতি যত্নে বাঁধা খোঁপাটী খুলিয়া দিলাম। একেবারে সব খুলিয়া গেল। আকাশে যেমনিতর মেঘের ঘটা, গৃহিণীর সুন্দর পৃষ্ঠোপরি তেমনিতর নিবিড় কেশের রাশি ছড়াইয়া পড়িল। খোঁপার উপর যে বেল্ মল্লিকা শোভা পাইতেছিল, সেগুলিও ছড়াইয়া পড়িল,—পড়িল গৃহিণীর সেই আল্‌তা-পরা রাঙ্গা

চরণতলে! তখন এলোকেশী, গ্রীবাটী বাঁকাইয়া, আবেশবিহ্বল আঁখি দুটী অভিমানে পূর্ণ করিয়া সকোপ-দৃষ্টে আমার পানে চাহিলেন। বলিতে কি, সেই মেঘভরা আকাশের ছায়াতলে, নীল-বসনা, উন্মুক্তকেশা সুন্দরীর সেই চাহনিতে, সেই সুকুমার ভঙ্গিতে, যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম, তেমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখিয়াছি, হঠাৎ মনে পড়ে না।—কিন্তু দূর হউক, এ সকল লিখিতে বসিলে আসল কথাই বলা হইবে না।

আমি বলিলাম,—"দেখ বাপের বাড়ী ত যাইবেই, কিন্তু আমার একটী কথা রাখ। এক-বার কাছে ব'স, আমি একখানি কাব্য পড়িয়া তোমাকে শুনাই।"

গৃহিণী তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কাব্য শুনিতে পার্শ্বে বসিলেন। আমি বর্ষার বিরহ-গাথা "মেঘদূত" পড়িতে মনস্থ করিলাম।

আমার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহাকে তাহা বুঝিতে দিলাম না।

তখন বৃষ্টি ছিল না। আকাশটা জুড়িয়া মেঘ উঠিয়াছিল। মেঘের ছায়ায় আমার ক্ষুদ্র কুটীরখানি, তাহার আশপাশের বৃক্ষব্রততী গুলিকে লইয়া মলিনমুখে বসিয়াছিল। প্রকৃতি গম্ভীরা, গাম্ভীর্য্যে বড় সুন্দরী। পুকুর ঘাট সব জলে ভরিয়া গিয়াছে, চারিদিকের গাছ-পালাতে নব নব পত্রোদ্গমে এক নূতন শোভা হইয়াছে; বন-[illegible] হইতে কৃষক গীতি, সেই ভরা পুষ্করিণীর উপর দিয়া আসিয়া, কি সুমধুর তানে প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে!

আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে স্তবকে স্তবকে বেল, মল্লিকা, জুঁতি ফুটিয়াছে; পথি-পার্শ্বে কদম্ব-শাখায় "বর্ষার গৌরব" কদম্ব ফুটিয়াছে; আমার হৃদয়-সরোবরে মূর্ত্তিমান পুণ্যের ন্যায়, পূর্ণশতদল ফুটিয়া রহিয়াছে—সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, শোভায়,

আমার চারিদিক উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল! সেই প্রফুল্ল-ময়ীর পুণ্য হাসিভরা মুখখানির পবিত্র জ্যোতিতে আমার কুটীর আলোকিত। আজি এই ঘন বর্ষার দিনে, এমনি প্রফুল্ল অন্তরে, প্রিয়তমার পার্শ্বে মহাকবির অপূর্ব্ব বিরহ-গাথা 'মেঘদূত' পড়িতে বসিলাম।

পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, পথ-হারা অতি-থির মত, একখানা খুব ঘন কালো মেঘ ঠিক যেন আমারই কুটীরের চালখানি ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পড়িতে পড়িতে থামিয়া সেই মেঘের পানে চাহিলাম। আমার মনে হইল, সে বুঝি কোন বিরহীর বিরহবার্ত্তা লইয়া, প্রণয়িনী সকাশে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাই ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—যদি কোন প্রবাসী বিরহী পায়! একবার সে আমার ঘরে উঁকি মারিল, দেখিল, সন্ধ্যার দীপ-শিখা নিস্তেজ করিয়া, আমার প্রিয়তমা আমারই পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

মেঘ অবশ্যই বুঝিল, এখানে কিছু হইবে না। তখন সে অতি নিরাশপ্রাণে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে হঠাৎ থামিয়া এই সব ভাবিতেছি, গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, থামিলে যে?—"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং"—বল না?"

তখন আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিলাম। ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আকাশ হইতে মেঘগুলা অনেক নামিয়া আসিল, বৃক্ষ-লতা নিশ্চল হইয়া ভিজিতে লাগিল। আমি আবার গোড়া হইতে পড়িতে লাগিলাম।

এক যক্ষ, কুবেরের ভৃত্য ছিল। যক্ষ, আপন প্রণয়িণীকে বড় ভালবাসিত। সে এতদূর যে, ভালবাসার মোহে, যক্ষ, কর্ত্তব্যকর্ম্মে বড় অব-

হেলা করিত। তাহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া, তাহার প্রভু কুবের, একদিন অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে শাপ দিলেন,—"তোমাকে এক বৎসরের জন্য দেশত্যাগী হইয়া প্রবাসে থাকিতে হইবে।"

প্রভুর নিষ্ঠুর অভিশাপে যক্ষের প্রাণ কাঁদিল। জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া, এক বৎসর তাহাকে প্রবাসে থাকিতে হইবে! এক বৎসর আর সে প্রিয়তমার মুখখানি দেখিতে পাইবে না!—এক বৎসর! বৎসরে কত মুহূর্ত্ত! মুহূর্ত্ত যাহাকে না দেখিলে সে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, এক বৎসর তাহাকে দেখিতে পাইবে না!—এ দীর্ঘ বিরহ সে কেমন করিয়া সহিবে?

যক্ষের বাড়ী অলকায়। কুবেরের অভিশাপে যক্ষের সে দেবভাব আর রহিল না। তখন পরাধীন, অভিশপ্ত যক্ষ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, অলকা

পরিত্যাগ করিয়া রামগিরি আশ্রমে গমন করিল। বড় আকুল প্রাণেই সে গৃহ ত্যাগ করিল।

যক্ষ রামগিরি আশ্রমে আসিল। যেখানে সতী-প্রতিমা সীতাদেবীর স্নানে জল পবিত্র হইয়াছিল, এ সেই রামগিরি। এই আশ্রমে থাকিয়া, বড় দুঃখেই যক্ষ, প্রিয়া-বিরহ-ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। দারুণ বিরহতাপে যক্ষ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। সে এত কৃশ হইয়া গেল যে, একদিন তাহার হাতের বলয় কোথায় খসিয়া পড়িল! আর সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে প্রভাব নাই! এমনি ভাবে সে আট-মাস কাটাইল,—বড় দুঃখেই কাটাইল। শেষে বর্ষা আসিল।

বর্ষা আসিল, যক্ষের ভয় হইল। সে এত-দিন সকল দুঃখ সহিয়াছে, চোখের জল বুঝি চোখেই মারিয়াছে, বুঝি যখন বড়ই অসহ্য হই-য়াছে, আশ্রম নিকটবর্ত্তিনী কোন পুণ্যতোয়া

নদীর তরঙ্গে আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়াছে। এমন করিয়াও ত এই আটমাস কাটিয়াছে, কিন্তু এই বর্ষা কাটিবে কেমন করিয়া? বর্ষায় প্রবাসে বিরহীর প্রাণ যে কি করে, যক্ষ বুঝি অল্পেই তাহা বুঝিয়াছিল, তাই তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। আর সেই বিরহ-বিধুরা, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা যক্ষ-পত্নী—সেই বা কেমন করিয়া, সে কুসুম-কোমল হৃদয়ে বর্ষাবিরহের প্রচণ্ড পীড়ন সহিবে? ভাবিয়া যক্ষ আকুল।

বর্ষায় বুঝি প্রাণে এমনই একটা আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে যে, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে নিকটে না পাইলে প্রাণ বড় আকুল হইয়া পড়ে; যাহাকে পাই না, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বুঝি তাহাকে খুঁজিতে থাকি।

এমনই অবস্থায়, আষাঢ়ের প্রথম দিন, যক্ষ দেখিল, একখানা ঘনমেঘ রামগিরির তটদেশ জুড়িয়া আছে। মেঘখানা আকৃতিতে একটা

হস্তির মত, সে যেন সেইখানে ক্রীড়া করিতেছে। আষাঢ়ের আকাশে, সেই মেঘের ক্রীড়া দেখিয়া, বিরহী যক্ষের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল! নিদ্রায় ও জাগরণে, দিবানিশি অলকা তাহার মনে জাগিতেছে। আজ আবার দ্বিগুণ করিয়া সে আগুন জ্বলিল! মনে পড়িল—সেই অলকা, অলকায় যক্ষের সেই গৃহ, গৃহ-লক্ষ্মী প্রেম-প্রতিমা সেই প্রিয়তমা! প্রিয়তমা কেমন আছে? কি করিতেছে? কেহ আসিয়া কি তাহার সংবাদটা দিতে পারে না? কেহ কি যক্ষের দুইটা সান্ত্বনার কথা লইয়া, তাহার প্রণয়িনীর কাছে যাইতে পারে না? ভাবিতে ভাবিতে যক্ষ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। মেঘের পানে চাহিয়া ভাবিল, মেঘ ত নানা দেশে চলিয়া বেড়ায়, তাহার দ্বারা প্রিয়তমাকে দুইটা কথা বলিয়া পাঠান যায় না? মেঘ কি, এ উপকার টুকু করিবে না? এই ভাবিয়া বিরহোন্মত্ত যক্ষ,

কুটজ-কুসুমে মেঘের অভ্যর্থনা করিল, শেষে অলকায় যাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল।

মেঘ এইরূপে দূত হইল,—বুঝিলে কি? যক্ষ, মেঘকে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিল,—

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মেঘ অলকায় যাইতে স্বীকার করিল? এ দূতিগিরি করিতে আপত্তি করিল না?"

মেঘ আবার আপত্তি করিবে কি? যক্ষ বুঝিয়া লইল, মেঘ অলকায় যাইতে স্বীকার করিল। মদনসন্তপ্ত বিরহী যাহা ভাবে, সে মনে করে, তাহার সেই ভাবনা ঠিক। সে যেরূপ ভাবিয়া সুখী হয়, সেইরূপ ভাবিয়া থাকে, সত্যা-সত্যের বিচার বড় একটা করে না। নহিলে মেঘ কখনও দূত হয়, না তাহার কথা লইয়া অলকায় যাইবে—এইরূপ ভাবনা সে ভাবে?

গৃহিণীর মুখপানে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি কি ভাবিতেছেন। একটু বড় মধুর রহস্যের হাসিরেখা, অধরোষ্ঠের মাঝখান টুকুতে তাম্বূল রাগের সহিত মিশিয়া, বড় সুন্দর দেখাইতেছে। আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাবিতেছ কি?"

গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ভাবিতেছি এই, বলি এ ব্যাপারটা কি? বিরহ কি এমনই জিনিস যে, চেতন অচেতনে জ্ঞান নাই? মেঘ আবার দূত হইল! মেঘের সহিত আলাপ! আমার মনে হয়, কবি কালিদাসের এ সব বাড়াবাড়ি!"

বাড়াবাড়ি কিছুই নহে। যে চিত্তবিকারে এমন দশা ঘটে, ভাব দেখি, সে কি ভয়ানক চিত্তবিকার! কবিও নিজে বলিয়াছেন,—"কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"—যাহারা কামাতুর, চেতন অচেতন বিবেচনা

করিয়া দেখিবে, সে টুকু বুদ্ধি তাহাদের ঘটে নাই। তারপর শুন, যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তত্প্রয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতি ক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা॥
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহিতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যায়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥

—হে মেঘ, বিরহ-সন্তপ্ত জনের তুমিই ভরসা। তুমি এ অভাগার মুখপ্রতি চাও। দেখ, ধনপতি কুবেরের নিষ্ঠুর অভিশাপে কি যন্ত্রণাই আমি ভোগ করিতেছি! তুমি আমার প্রিয়ার কাছে দুইটা সংবাদ লইয়া যাও। এখান হইতে বরাবর অলকায় গমন কর, অলকায় যক্ষদিগের কৌমুদি-বিধৌত সুন্দর অট্টালিকা সকল দেখিতে পাইবে। আমার প্রিয়তমাও সেখানে আছে।

দেখ, তুমি আকাশে উঠিবে, আর বিরহ-

রা রমণীগণ চোখের আশপাশ হইতে অলকা-
সরাইয়া সরাইয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে।
মায় দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইবে, তাহা-
প্রিয়জনেরাও প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসি-
ছে। কেন না, তোমায় দেখিয়া কোন্ প্রবাসী,
হ-বিবশা প্রিয়তমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে?
মি পরাধীন ভৃত্য,—হায়! আমার কপালে সে
নাই!

যক্ষ, তখন মেঘকে অলকায় যাইবার জন্য
নুরোধ করিল এবং বলিল যে, মৃদুমন্দ অনুকূল
য়ু বহিবে, মেঘের হৃদয় তাহাতে শীতল হইবে।
াকাগণ ফুলের মালার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া
ঘের চারিপার্শ্বে খেলিতে থাকিবে, চাতক
মিষ্ট গান করিতে করিতে মেঘের বামপার্শ্বে

---

* বামপার্শ্বে কেন? টীকাকারেরা এ বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ
ইয়াছেন। পণ্ডিত রামনাথ তর্কালঙ্কার বলেন, 'বাম' শব্দে Beauti
তিনি বলেন পক্ষী কূজন শুভসূচক বটে, কিন্তু তখন তাহারা

প্রফুল্ল অন্তরে ছুটিতে থাকিবে।—যক্ষ, মেঘকে এত সুখের ছবি দেখাইল, মেঘ না যাইবে কেন?

বুঝি যক্ষ বুঝিয়াছিল, হয়ত মেঘ যাইতে চাহিবে না। কে জানে, হয়ত পথে কত কষ্ট আছে। কেনই বা মেঘ তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবে? তাই যক্ষ এক এক করিয়া দেখাইয়া দিল, কষ্ট কিছুই নাই, বরং সুখ আছে। কিন্তু তবু যক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাই একটু পাকাপাকি রকম করিবার জন্য বলিতে লাগিল,—

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥

—মেঘ, তুমি অলকায় গিয়া, বিরহিণী পতিব্রতা তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে পাইবে।

দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই সঙ্গীত করে। ভারতমল্লিক বলেন, চাতক পক্ষী এ নিয়মের ব্যভিচার করে; তাহারা বামেই থাকে এবং তাহাতেই শুভসূচনা হইয়া থাকে।

গৃহিণী।—"মেঘের আবার ভ্রাতৃজায়া কে?"

বুঝিলে না? যক্ষ, মেঘের সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধ পাতাইল। যক্ষ ভাবিল, মেঘ এখন আমার ভাই হইল, এখন আর সে কোন ওজর করিতে পারিবে না, ভাইয়ের জন্য ভাই আর এই উপকার টুকু করিবে না? এখন মেঘ কেবল দূত নহে, যক্ষের ভাই; কাজেই যক্ষের পত্নী, মেঘের ভ্রাতৃজায়া হইল।—বুঝিলে কি?

গৃহিণী। বুঝিলাম। কিন্তু প্রবাসী হইলে, বর্ষায় কি এমনই বিরহোন্মাদ ঘটে?

এখন শুন, যক্ষ বলিতেছে,—

—ভাই মেঘ, তুমি অলকায় গিয়া, বিরহিণী পতিব্রতা তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে পাইবে। কবে আমার শাপ মোচন হইবে, কবে আবার আমাদের মিলন হইবে, বসিয়া বসিয়া সে, সেইদিন গণিতেছে। আমারই আশায় সে এতদিন

বাঁচিয়া আছে। বৃন্ত যেমন ফুল গুলিকে ধরিয়া রাখে—ঝরিতে দেয় না, তেমনি বিরহে যখন অবলাগণের কুসুম-কোমল হৃদয় ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, আশা অমনি সেই বৃন্তের মত তাহা ধরিয়া রাখে,—ঝরিতে দেয় না।

তারপর যক্ষ আবার বলিতে লাগিল,—মেঘ বরাবর চলিয়া যাইবে, তাহার মধুর গম্ভীর গর্জ্জনে তৃষিতা মেদিনীর প্রাণ জুড়াইবে এবং রাজহংস সকল মানস-সরোবরে যাইবার জন্য, কৈলাস-পর্ব্বত পর্য্যন্ত মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। * পথে অনেক পাহাড় পর্ব্বত পড়িবে, শ্রান্তদেহ মেঘ সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিবে; কোথাও

* কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্তই মেঘকে যাইতে হইবে। রাজহংস সকল কৈলাস পর্য্যন্ত মেঘের অনুসরণ করিবে। কবিরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, প্রতি বর্ষা সমাগমে রাজহংস সকল মানস-সরোবরে গমন করিয়া থাকে। কৈলাসের মধ্যেই মানসসরোবর অবস্থিত।

নদ নদী পড়িবে, তাহার শীতল বারিসংস্পর্শে মেঘের ক্লান্তি দূর হইবে।

এখন যক্ষ একটু নিশ্চিন্ত হই৷ তাহার মনে হইল, মেঘের আপত্তি ক কোন কারণ নাই। এইবার সে অলকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল। মেঘ কোন্ পথে যাইবে? রামগিরি ছাড়িয়া মেঘকে অলকায় যাইতে হইবে। যে সকল পাহাড়, পর্ব্বত, নদ-নদী দেশ উপবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে—যক্ষ, একে একে মেঘকে সেই সকল বলিয়া দিতে লাগিল।

এই উপলক্ষে, কবি অনেক দেশ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকল বর্ণনা এত ভাবময় ও কবিত্বপূর্ণ,—এত সুন্দর ও মধুর যে, দুই একটি কথায় তাহার কিছুই বলা যায় না। পাশ্চাত্য কবিগণ পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদীর অনেক অনেক বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মহাকবির

বর্ণনা, স্থানে স্থানে সে সকলও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

গৃহিণী।—কবি এই স্থলে, যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, কিংবা যে সকল পর্ব্বত ও নদীর অবতারণা করিয়াছেন, সে সকল কি যথার্থ, না তাঁহার অমানুষী কল্পনা প্রসূত ?

আমার বোধ হয়, দুই একটি যথার্থ না হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই সত্য। আজিও তাহার অনেক স্থান বিদ্যমান আছে। তবে কালক্রমে অনেকগুলির নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। তারপর শুন।

রামগিরি ছাড়িয়াই মেঘকে উত্তর দিকে যাইতে হইবে। সেখানে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনাগণ সহসা মেঘকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিবে, ভাবিবে হয়ত বাতাস গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া চলিয়াছে!

তারপর, পূর্ব্বদিকে ফিরিতে হইবে। সেখানে

মালক্ষেত্র পড়িয়া আছে। চারিদিক সৌগন্ধে পরিপূর্ণ। তথায় সরলহৃদয় জনপদ-বধূগণ প্রীতি প্রফুল্লনেত্রে মেঘের পানে চাহিয়া থাকিবে !

মালক্ষেত্র পশ্চাতে রাখিয়া, মেঘকে আবার উত্তরদিকে ফিরিতে হইবে। সেখানে আম্র-কূট পর্ব্বত। মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া, কতবার তাহার দাবাগ্নি নিবারণ করিয়াছে, মেঘের সেই উপকার আম্রকূট কখনই ভুলিতে পারিবে না।

> ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
> প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ।

যে অতি ক্ষুদ্র, অতি অধম, সেও কখন বন্ধুর উপকার ভুলে না ; যে উন্নত ও মহৎ, সে কি কখন কাহারও উপকার ভুলিয়া থাকিতে পারে ? অতএব আম্রকূটে মেঘ যথেষ্ট অভ্যর্থনা পাইবে।

আম্রকূট হইতে কিছু নিম্নে, মেঘ চিত্রকূট দেখিতে পাইবে। যক্ষ বলিয়া দিল—“তুমি এক-

বার চিত্রকুটে নামিও, শীতল বারিধারায় তাহার নৈদাঘ বহ্নি নিবাইয়া দিও।”

যক্ষের হৃদয়ের অবস্থাটা বুঝিও। সে যেমন নিজের বুকের আগুন নিবাইতে ব্যস্ত, তেমনই কে কোথায় পুড়িতেছে, তাহার জন্যও তাহার প্রাণ কাতর; তাই মেঘকে সকাতরে বলিয়া দিতেছে,—এখানে একটু শীতল ছায়া দিও, সেখানে একটু স্নিগ্ধ বারি বর্ষণ করিও, অন্যত্র একটু গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে কাহারও হৃদয়ে আশা দিও। যা'র বুকে নাকি আগুন জ্বলে, সেই জ্বালা বুঝিয়া পরের আগুন নিবাইতে যত্নবান্ হয়।

আম্রকূট ফেলিয়া মেঘ তারপর বিন্ধ্যাচলে পঁহুছিবে। মেঘ দেখিবে, বিন্ধ্যার পাদদেশে বিশীর্ণা রেবানদী বহিয়া চলিয়াছে। রেবার তরঙ্গসংস্পর্শ সুশীতল সমীরণে মেঘের শ্রান্তিদূর হইবে। রেবার চারিদিকে মনোহর শোভা!

বর্ষাসমাগমে প্রকৃতি হাস্যময়ী। বৃক্ষলতার শ্যাম শোভা, কুসুম রাশির মধুর বিকাশ, বিহঙ্গ কুলের সুমিষ্ট সঙ্গীত, মেদিনীর সৌরভরাশি—মেঘের পথের চারিদিকেই কি শোভা! পর্ব্বত-বাসী ও অরণ্যবাসী কিন্নর কিন্নরী সতৃষ্ণনয়নে মেঘের পানে চাহিয়া থাকিবে—দেখিবে, মেঘের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বলাকাগণ চলিয়াছে;—মেঘের কোলে সেই বলাকার শ্রেণী—আহা! কি সুন্দর! চাতক, বারিবিন্দুর জন্য মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তৃষিতনয়নে চাহিয়া চলিয়াছে! যখন সেই কিন্নর কিন্নরী দেবগণ মেঘের মধুর গর্জ্জন শুনিবে, কতক ভয়ে, কতক উল্লাসে, তখন তাহারা স্ব স্ব প্রণয়িনীদিগকে আলিঙ্গন করিবে, আর মেঘের অভ্যর্থনা করিতে থাকিবে!

এমন পথ পর্য্যটন করিতে মেঘ না চাহিবে কেন?

কিন্তু মেঘকে এতটা প্রলোভন দেখাইয়া দিয়া,

যক্ষের একটু ভয় হইল। কি জানি, যদি সে বিলম্ব করে? যদি সে পথের মাঝে কাহারও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আর অলকায় না যায়? কি জানি, প্রণয়ি-হৃদয় এতই সন্দিগ্ধ বুঝি! যক্ষ তাই কাতরভাবে কি বলিতেছে, শুন ঃ—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং য়িয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥

—সখে মেঘ, যদিও তুমি আমার প্রিয়তমার কাছে শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিবে বটে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্র যাইতে পারিবে না। কুটজ কুসুমের সুগন্ধে পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমার বিলম্ব হইবে। তোমায় দেখিয়া ময়ূর ময়ূরী আনন্দাশ্রু ফেলিতে থাকিবে; যখন তাহারা সেই জলভরা আঁখি দুটীতে তোমার পানে চাহিয়া তোমার সাদর সম্ভাষণ করিবে, —তখন কি তোমার আর কিছু মনে থাকিবে?

দেখিও, একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইও!

তারপর মেঘ দশার্ণদেশে পৌঁছিবে। বিদিশা, দশার্ণদেশের রাজধানী। তথায় বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। তরঙ্গচঞ্চলা বেত্রবতী সুন্দর তটপ্রদেশে মধুর শব্দ করিতেছে। কামার্ত্ত যেমন বিলাসিনীর অধর চুম্বনে তৃপ্তি লাভ করে, বেত্রবতীর সে নির্ম্মল মুখখানি দেখিয়া, মেঘকেও একবার সে নদীজল পান করিতে হইবে!

গৃহিণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মেঘের ত বড় গরজ!"

মেঘের গরজ আছে কি না বলিতে পারি না। যক্ষের কথায় মেঘ তাহা করিবে কিনা, কে জানে? কিন্তু যক্ষ যদি মেঘ হইত, সে, ও সকল কথনই উপেক্ষা করিয়া যাইতে সক্ষম হইত না।

যক্ষ বলিয়া দিল,—“বিদিশার কোন পাহাড়-প্রদেশে ক্ষণেক বিশ্রাম করিও, তারপর—

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানিসিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়ন রুজাক্লান্ত কর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাত্ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥

একটু বিশ্রাম করিয়া, একবার বননদীতীরে যাইও। বননদীতীরে কুসুম উদ্যানে যূথিকা কুঁড়িগুলিতে একটু নবজলকণা সিঞ্চন করিও; আর সেখানে যে রমণীগণ কুসুমচয়ন করিতে করিতে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, রৌদ্রে যাহাদিগের কপোলদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, কাণের কুসুম আভরণগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সেই রমণীগণকে একটু খানির জন্য তোমার ছায়া দিয়া যাইও।

গৃহিণী কিছু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—“কবি বস্তুতই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। যেখানে রমণীর কোন প্রসঙ্গ পাইয়াছেন, যক্ষ সেই খানেই

যেন একেবারে অধীর! রমণীর প্রতি পুরুষের এ প্রকার ভাব নিতান্ত ঘৃণাকর! আমি বেশ বলিতে পারি, যক্ষের প্রণয়িনী যদি এ সকল শুনিত, সে নিশ্চয়ই ঘৃণায় মরিয়া যাইত।”

আমি ত শুনিয়াই অবাক! যক্ষ যে প্রবাসী বিরহী, কামাতুর,—কবি ত প্রথমেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বিরহে যাহার এমন চিত্ত-বিকার ঘটিয়াছে যে, মেঘকে পর্য্যন্ত দূত বানাইতে পারিয়াছে, সে যে এমন হইবে, তাহার বিচিত্র কি? তুমি কি এতক্ষণে ইহাই বুঝিলে?

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন,—“ভয় নাই, তোমার এ পরিশ্রম বৃথায় যাইতেছে না। ভাবিতেছি এই, মেঘের পথের চারিধারেই ত প্রকৃতির মধুর শোভা; হইতে পারে, সেই শোভার মাঝে যে কোন প্রকারে হউক, রমণীপ্রসঙ্গ আনিতে পারিলে, শোভাময়ী প্রকৃতি আরও সুন্দরী হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে যা কিছু সুন্দর, যে

সকলই কি যক্ষের চক্ষে পড়িতে হয় ? আর সুন্দর দেখিলেই কি অমনি হাঁ করিয়া থাকিতে হয় ?”

“সুন্দর দেখিলেই হাঁ করিয়া থাকিতে হয় ?” এ কথার ঠিক উত্তর কোথাও পাই নাই। চিরদিন ইহাই দেখিয়া আসিতেছি, সৌন্দর্য্যের চরণে মানুষ চিরদিনই অবনত। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। সৌন্দর্য্য কোথায় নাই ? বৃক্ষলতায়, কীটপতঙ্গে, তৃণ গুল্মে, চন্দ্রসূর্য্যে—সৌন্দর্য্য কোথায় নাই ? শিশুর হাসিতে, ব্রীড়াময়ীর সৌকুমার্য্যে, নদীর তরঙ্গে, গোবৎসের স্নিগ্ধ পাটলীবর্ণে, নিবিড় মেঘের নীলিমায়—সৌন্দর্য্য কোথায় নাই ? সাগরে ভূধরে, গহনে প্রান্তরে,—চারিদিকে সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। এমন সৌন্দর্য্যের হাটে তবু মানুষ সৌন্দর্য্যের ভিখারী। নয়ন তৃপ্ত হয় না, আশা মিটে না, সাধ পূর্ণ হয় না। তাই জন্ম জন্ম সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়া, রূপেন্দ্রিয় তবুও সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। যে, অন্তরে

কলুষিত; যে, পাপচক্ষুতে বিষের ধারা ঢালিয়া সৌন্দর্য্যের মুখ মলিন করিয়াছে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষে পড়িবে না,—সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের উপাসক হইতে পারিবে না। মানবপ্রাণে সৌন্দর্য্যের পিপাসা অতি বলবতী। কেন, তা বুঝি না, কিন্তু মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের দাস, যেখানে সৌন্দর্য্য, সেই খানেই তাহার মস্তক অবনত। তারপর শুন,—

যক্ষ বলিয়া দিল,—"মেঘ, বননদীতীর হইতে উজ্জয়িণীতে যাইও। পথটা একটু বাঁকা বটে *, কিন্তু তাহা হইলেও একবার সেখান হইয়া যাইও। কেন?—

> বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
> লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

তোমার বিদ্যুল্লতার বিলাস দেখিয়া, উজ্জ-

---

* বিদিশা হইতে অলকা ঠিক উত্তরে, উজ্জয়িণী কিছু পশ্চিমে। উজ্জয়িণী দেখিয়া যাইতে হইলে মেঘকে কিছু পশ্চিম ঘুরিয়া যাইতে হয়।

য়িণীর পুরনারীরা চকিত নয়নে, চঞ্চল কটাক্ষে তোমার পানে চাহিবে,—তুমি যদি সে সুখে বঞ্চিত হও, তবে তোমার চক্ষু থাকিয়াও অন্ধ,—তোমার জন্মই বৃথা !”

গৃহিণী বলিলেন,—

“পথটা ত বলিলে বাঁকা, মেঘেরও শীঘ্র যাইতে হইবে, তবে আবার এ চঞ্চলনয়নার কটাক্ষ দেখিবার লোভ দেখান কেন? সোজা পথ ধরিয়া যাইলেই ত চলিত?”

তুমি ঠিক ধরিয়াছ বটে, কিন্তু কথা কি জান, উজ্জয়িণী নাকি কবির স্বদেশ, স্বদেশের প্রতি কবির যথেষ্ট প্রাণের টান ছিল, তাই একটু কৌশল করিয়া তিনি উজ্জয়িণীর সৌন্দর্য্যটা দেখাইতে চাহেন। াই মেঘকে একটু ঘুরিয়া

কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন, উজ্জয়িণী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী; কবি, রাজার মনোরঞ্জনার্থই নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে এখানে উজ্জয়িনীর অবতারণা করিয়াছেন।

যাইতে বলিলেন। কিন্তু সোজাপথ ছাড়িয়া সহজে কে বাঁকা পথে যাইতে চাহে? সেই জন্য কবি, যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে একটা প্রলোভন দেখাইয়া দিলেন যে, সেখানে চঞ্চল-নয়না পুর-নারীর কটাক্ষ দেখিতে পাইবে। মেঘ কি এখন না যাইয়া থাকিতে পারিবে?

গৃহিণী।—কিন্তু তাহাতে ত যক্ষেরই ক্ষতি, মেঘেরও ত বিলম্ব হইতে পারে?

তা ঠিক। কিন্তু তুত স্বার্থপর হইলে চলিবে কেন? যাহার দ্বারা কাজ লইতে হইবে, তাহার একটু মন না রাখিলে কেমন দেখায়? যেখানে যা' সুন্দর, যক্ষ তাহা জানে, মেঘকে সে সকল বলিয়া দিলে মেঘ কত সন্তুষ্ট হইবে!

মেঘ যখন নির্বিন্ধ্যানদী দেখিতে পাইবে, তখন কত পুলকিত হইবে। নবীনা যুবতীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণের ন্যায়, নির্বিন্ধ্যার সে জল-কল্লোল কি শ্রুতিমধুর! রূপসীর ভ্রূভঙ্গীর ন্যায়

নির্ব্বিন্ধ্যার সে বীচি-বিভ্রম কি হৃদয়-উন্মত্তকারী! মেঘকে যেন বুকের ভিতর পূরিবার জন্য, নির্ব্বিন্ধ্যা তাহার বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া আছে!

নির্ব্বিন্ধ্যার পরেই সিন্ধুনদী। এই দারুণ উত্তাপে সিন্ধু শুকাইয়া গিয়াছে। মেঘ যেন তাহা উপেক্ষা করিয়া না যায়।

তারপর, মেঘ যখন অবন্তীনগরে পৌঁছিবে, যক্ষ বলিয়া দিল, সে যেন সে নগরের শোভা দেখিতে ভুলিয়া না যায়। অবন্তী, মর্ত্ত্যভূমে ইন্দ্রের আবাসস্থান, কবির কল্পনাতীত সুখের দেশ! অবন্তীর বৃদ্ধেরা বৎসরাজের কত গল্পই জানে। প্রেম-পাগলিনী সেই বাসবদত্তা,—বৎস-রাজের সেই বীরত্ব,—আহা! এই আষাঢ়ের দিনে কত সুখেই তাহারা সেই সকল আলোচনা করি-তেছে! মেঘ যেন সে সকল উপেক্ষা করিয়া না যায়।

যক্ষ আরও বলিয়া দিল,—"ভাই মেঘ! তুমি

পরম রূপবতী যুবতীকুলের পদতলস্থ অলক্তরাগে রঞ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত প্রাসাদ সমূহে উপবেশন পূর্ব্বক বিশালানগরীর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সন্দর্শনে পথশ্রম অপনয়ন করিতে পারিবে। গৃহপালিত ময়ূরগণ সুহৃৎ-প্রণয়ের বশীভূত হইয়া তোমাকে প্রীতিপূর্ণ নৃত্য-উপহার প্রদান করিবে।”

উজ্জয়িণীতে মহাকাল দেবের মন্দির। মেঘ যখন সেই মন্দিরে যাইবে, যক্ষ বলিয়া দিল—“মেঘ! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিও। সন্ধ্যায়, মহাকাল দেবের মন্দিরে পূজার জন্য শঙ্খ ঘণ্টা বাজিবে, তুমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করিও। তারপর দেখিবে, নর্ত্তকীরা আসিয়া নিত্য করিবে। তাহাদের চরণ নিক্ষেপে নূপুরগুলি বাজিতে থাকিবে, কঙ্কণকান্তি-খচিত চামর দণ্ড ব্যজন করিতে করিতে তাহাদের হাতগুলি ক্লান্ত হইয়া

পড়িবে ;—তুমিও সেই সময় একটু বারিবর্ষণ করিও, তাহাদের পাদুকাশূন্য কোমল চরণগুলি তাহাতে জুড়াইবে ! তোমার সুস্নিগ্ধ বারিবর্ষণে তাহারা কত সুখী হইবে। তাহারা সেই বিশাল আঁখির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তোমার পানে চাহিবে ! সে সুখে যেন তুমি বঞ্চিত হইও না।"

উজ্জয়িনীতে আর কি দেখিবে ?

> গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
> রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
> সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
> তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

—যখন দেখিবে, উজ্জয়িনী রাজপথে অভিসারিণী রমণীগণ সূচীভেদ্য অন্ধকারে, আপনাদিগকে লুকাইয়া অভিসারে চলিয়াছে, তখন তুমি তোমার স্বর্ণপ্রভা স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলো দেখাইয়া তাহাদের পথ দেখাইও, কিন্তু গর্জ্জন করিয়া যেন তাহাদিগকে ভয় দেখাইও না,—তাহারা বড় ভীরু !

যক্ষ, রাত্রিতে মেঘকে চলিতে নিষেধ করিল। বলিয়া দিল, কোন সুখপ্রদ স্থানে বিশ্রাম করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইলে, সূর্য্যো-দয়ে আবার চলিতে থাকিবে। কিন্তু যক্ষ সাবধান করিয়া দিতেছে,—"দেখিও, সূর্য্যের পথে দাঁড়াইয়া গোল বাঁধাইও না। দেখ, খণ্ডিতা-কামিনী, সারানিশি প্রিয়বিরহক্লেশ ভোগ করিয়া, সূর্য্যোদয়ে প্রিয়তমকে পাইয়া আঁখি-জল মুছিয়া থাকে; সূর্য্যও নিজ প্রিয়তমা নলিনী সুন্দরীর শিশির-অশ্রু মুছাইতে থাকেন। অত-এব তুমি তাঁহার পথে দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলে তুমি বিশেষরূপে তাঁহার বিদ্বেষের কারণ হইবে!"

তারপর মেঘকে আরও অনেক নদ নদী অতিক্রম করিতে হইবে। সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী সকলের বর্ণনা এত হৃদয়গ্রাহিণী যে, দু' এক কথায় তাহার কিছুই বলা হয় না।

যক্ষ বলিয়া দিল, এই সকল অতিক্রম করিয়া, মেঘ অবশেষে কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইবে। সে বর্ণনাই বা কি সুন্দর !

যক্ষ বলিতেছে,—

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

—"মেঘ ! তারপর তুমি কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইবে। দশানন রাবণ এক সময় ভুজ-বলে কৈলাসকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ত্রিদশবনিতাগণের দর্পণের মত সে গিরি অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তাহার নির্ম্মল শৃঙ্গদেশ এত উচ্চ যে, তাহা আকাশ ব্যাপিয়া আছে ! সে রজতশুভ্র কৈলাসগিরি দেখিয়া মনে হইবে, যেন দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতিদিনের হাসি একস্থানে রাশীভূত হইয়া রহিয়াছে ! ভাই মেঘ ! তুমি সেইখানে অতিথি হইও।

যদি দেখ, সেই ক্রীড়াশৈলে হরগৌরী পরস্পরে হাতে হাত দিয়া পাদচারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তবে তাঁহাদিগের আরোহণের জন্য তোমার শরীর দিয়া সোপান করিয়া দিও, সে পাদস্পর্শে তুমি কৃতার্থ হইবে।

সেখানে দেখিবে, সুরযুবতীগণ ক্রীড়া করিতেছে। অতি গ্রীষ্মের সময় তোমায় পাইয়া, তাহারা মনে করিবে, বুঝি তুমি জলপূর্ণ কোন যন্ত্র-বিশেষ। তখন তাহারা তোমায় গোলাপ-পাশের মত ঘুরাইতে থাকিবে, বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার বারি ঝরিবে,—তাহাতে তাহারা স্নিগ্ধ হইবে! যদি তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে না পার, তবে একটু গর্জ্জন করিও,—ভয়ে তাহারা তোমায় ছাড়িয়া দিবে!

এইবার অলকা! যক্ষ বলিয়া দিল, কৈলাসের উৎসঙ্গ দেশে, প্রিয়তম বন্ধুর মত, অলকা অবস্থিত।

সেই রামগিরি আশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণে আমরা অলকায় পৌঁছিলাম! সেই রামগিরির তটপ্রদেশ হইতে এক এক করিয়া কত দেশ, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী অতিক্রম করিয়া অলকায় আসিতে হইল! প্রতিবারেই মনে হইয়াছে, যেন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, প্রতি-বারেই কবি নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, পথি-কের শ্রান্তি অনুভব করিতে দেন নাই! পথি-কের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে,—শ্রান্তি কোথায়, ক্লেশ কোথায়! রামগিরি হইতে অলকার যে পথ, সে সারাপথই কুসুমাবৃত! কুসুমেও কণ্টক আছে, কিন্তু সে পথে যে কুসুম, তাহাতে বুঝি একটিও কণ্টক নাই! এত সুধারাশি কোন্ কাব্যে আছে?

রামগিরি হইতে যখন অলকায় আসিয়া পৌঁছিলাম, মনে হইল, যেন কোন স্বপ্নমন্ত্রে চলিয়া আসিয়াছি! যেখানে যাহা দেখিয়া আসিলাম,

হৃদয়-মাঝে চিরদিনের জন্য তাহা অঙ্কিত রহিল! সেই উজ্জয়িনী,—শ্যাম-শোভায় প্রকৃতি হাস্যময়ী, প্রীতিপ্রফুল্লতায় নর-নারী উৎফুল্ল; সেই অবন্তী, নরলোকে অমরাবতী, বৎসরাজের বীরত্ব, বাসবদত্তার প্রেম;—সে সকল কি কখন ভুলিব? সেই বেত্রবতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গঙ্গা, যমুনা,—কূলে কূলে সৌন্দর্য্যরাশি উছলিয়া পড়িতেছে; সেই বন-নদীতীরে কুসুম-কানন, বেলা, মল্লিকায় চারিদিক সুরভিপূর্ণ; মধুরকণ্ঠ বিহগের সুধা-সঙ্গীতে নিনাদিত,—সে সকল কি ভুলিবার? প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য এমন করিয়া কয়জন দেখাইতে পারে? এমন "সরলে শোভাময়ী" ভাষাই বা আর কাহার? "মেঘদূত" আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য।

গৃহিণী।—এই সকল বর্ণনার মধ্যে বিরহ-বিধুর যক্ষের হৃদয়টুকুও কেমন চিত্রিত হইয়াছে! প্রতি ছত্রে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয়,

প্রতি কথায় তাহার মর্ম্ম-কাতরতার উচ্ছ্বাস! যক্ষ, যখনই কোন দেশ, কোন পর্ব্বত, কি কোন নদীর অবতারণা করিয়াছে, সমস্ত হৃদয়টুকু যেন তাহাতে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার হৃদয়-ভরা দারুণ দুঃখের ছায়া, সেই সকলের উপর পড়িয়া, বর্ণনাগুলি এতই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে! প্রিয়-তমার মিলন-আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিত কি জীবন্ত উচ্ছ্বাস! আর মহাকবির কি সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা! এমন মহীয়সী শক্তি না থাকিলে, এ অনন্ত সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ, "বাসনার মোক্ষধাম", এ "লক্ষ্মীর বিলাস-পুরি" আর কে দেখাইতে পারিত?

সে সকল পরে বলিব। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এই বর্ষা-বিরহের দৌরাত্ম্যটা কত!

গৃহিণীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, লজ্জার রক্তিম-আভা তাঁহার মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, অস্ফুট একটু হাসিরেখা অধরোষ্ঠের মাঝখান-

টুকুতে ক্রীড়া করিতেছে! তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বুঝিলাম, আমার এ পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে,—মহাকবি কালিদাসের লেখনীও সার্থক হইয়াছে!

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। রাত্রি জ্যোৎস্না-ময়ী। সেই বৃষ্টির পর, ঘোলাটে ঘোলাটে জ্যোৎস্নাটুকু বড় মধুর লাগিল। তেমন মধুর রাত্রে, তেমন মধুর বিরহ-গাথা, কত মধুর লাগে! আমি আবার আরম্ভ করিলাম।

যক্ষ, রামগিরি আশ্রম হইতে অলকা পর্য্যন্ত—সমস্ত পথের পরিচয় প্রদান করিল। পথের মাঝে যে কোন দেশ, যে কোন নদী বা যে কোন পর্ব্বত পড়িয়াছে, তাহার সহিত বিরহ-বিবশ যক্ষের আকুল প্রাণের যেন কি একটু সম্বন্ধ আছে,—তাই সে তাহার অন্তরের অন্তরে তাহা-দের কথা ভাবিয়াছে,—তাহাদিগকে উপেক্ষা

করিতে পারে নাই। প্রকৃতি হাস্যময়ী, অসীম সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যময়ী,—কিন্তু যক্ষের প্রাণ প্রিয়-বিরহ-ক্লেশে অবসাদগ্রস্ত; তবুও তাহার অন্তরে প্রকৃতির অসীম রূপরাশি জাগিতেছিল। চারি-দিকের অপূর্ব্ব শোভার মাঝে বিরহ-বিধুর যক্ষের কাতর হৃদয় টুকু আরও যেন অধিক ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু যে মর্ম্মকাতরতায় বুক ভাঙ্গিয়া যায় এবং একান্ত নিরাশনয়নে প্রকৃতির পানে চাহিয়া তাহার করুণ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে হয়, উপ-রন্ত সে সময়ে প্রকৃতির সম-বেদনা আত্মপ্রাণে উপলব্ধি করিতে হয়,—যক্ষের দুঃখ সেরূপ নহে। তাহার কারণ,সে জীবনে নিরাশ নহে। যে আশা-হীন, জগতের আলো তাহারই চক্ষে নিবিয়া গিয়াছে! তাই দেখি, যক্ষ আপনার দুঃখ যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে, তেমনই এই মধুর বর্ষার সৌন্দর্য্য, এবং সেই সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত দেশ-

প্রদেশের সৌন্দর্য্যও সে, জীবনে তেমনি উপলব্ধি করিতেছে। দুইটিরই পৃথক সত্ত্বা তাহার অন্তরে অল্পাধিক পরিমাণে জাগিতেছে। সে বুঝিতেছে, —একে ত তাহার দুঃখ অতি গভীর, তার উপর নিষ্ঠুর প্রকৃতি এমন মধুর সাজে সাজিয়া তাহার জ্বালা বুঝি আরও বাড়াইতেছে! বিরহ-তপোবনে, প্রেমময়ীর ধ্যানে বিভোর হইয়া, প্রভুর দারুণ অভিশাপ বুঝি সে অনায়াসে সহিতে পারিত, —কিন্তু বর্ষায় এমন হইল কেন? প্রকৃতি এমন মধুর শ্যাম-শোভায় সাজিয়া, কেন তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিল? এই আটমাস ত কাটিয়াছিল,—কৈ প্রাণে ত এমন দাবানল জ্বলে নাই; দরিয়ায় এমন তুমুল তুফানও ত উঠে নাই;- বিরহী হৃদয়ের উপর বর্ষার এতই দৌরাত্ম্য!

বর্ষার সহিত বিরহের নিশ্চয়ই কি যোগ আছে, নহিলে এমন হইবে কেন? আকাশে মেঘ উঠিয়া পৃথিবীর মুখ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,

বিরহীর হৃদয়ের উপরও যেন কি একটা আবরণ পড়ে! প্রাণ আকুল হয়, কাহাকে খুঁজিতে থাকি, কিন্তু কৈ তাহাকে ত পাই না! তার উপর আবার সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে প্রকৃতির নূতন শোভা দেখি, প্রাণের কত অতৃপ্ত বাসনারাশি জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে কাহার অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল মনে আসে—হায় সে কোথায়! তখন আর ধৈর্য্য থাকে না, বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, গৈরিক নিস্রাবের ন্যায় কাতর নয়ন-প্রবাহ বহিতে থাকে। তাহাতেই এই উচ্ছ্বাস! এমন বুঝিও না যে, তবে বুঝি যক্ষের দুঃখটা তত গভীর নহে। দেখিলে না কি, যক্ষের এই আকুল উচ্ছ্বাসেও কত অশ্রুবিন্দু জমাট বাঁধিয়া আছে,—কত দীর্ঘশ্বাসে কত কথার আধখানি ঢাকা পড়িয়াছে? দারুণ দুঃখে যখন বুক ভরিয়া উঠে, তখন এইরূপ উচ্ছ্বাসে বুকের ভার কিছু লাঘব হয়, প্রাণে কিছু সান্ত্বনা আসে। কিন্তু সে কথা থাক্।

যক্ষ, অলকার পথ বলিয়া দিয়া, এখন অলকার সৌন্দর্য্যরাশি বুঝাইতেছে।

মেঘ যখন অলকায় পৌঁছিবে, দেখিবে যে, অলকার প্রাসাদ সকলে মেঘের সাদৃশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে। মেঘ যেমন বুকের মধ্যে বিদ্যুল্লতা রাখিয়াছে, সেই প্রাসাদ সকলও তেমনি বিদ্যুদ্বরণী রমণীগণে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। মেঘ যেমন ইন্দ্রধনু-সুশোভিত, সেই প্রাসাদ সকল তেমনি সুন্দর চিত্র-ভূষিত; মেঘ যেমন স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ধ্বনিবিশিষ্ট, তাহারাও তেমনি বাদিত মুরজে প্রতিধ্বনিত; মেঘ যেমন অন্তরে সলিলপূর্ণ, তাহারাও তেমনি মণিরত্নপূর্ণ ভূমিভাগে বিদ্যমান; মেঘ যেমন উন্নত, তাহারাও তেমনি গগনস্পর্শী শিখরসম্পন্ন।

অলকার প্রাসাদগুলির এতই সৌন্দর্য্য। কিন্তু তারপর শুন :—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ॥

চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং।
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নী পং বধূনাম॥

—ভাই মেঘ! তুমি অলকায় দেখিবে, বধূগণের হস্তে লীলাকমল শোভা পাইতেছে। তাহাদের অলকে অভিনব কুন্দকুসুম দুলিতেছে, বদনমণ্ডলে লোধ্রকুসুমের পাণ্ডুপরাগ রঞ্জিত রহিয়াছে, কেশপাশে নবকুরুবক ফুটিয়া আছে, কর্ণে চারু শিরীষফুল হাসিতেছে, আর সীমন্তে "বর্ষার গৌরব" কদম্ব শোভা পাইতেছে।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন,—"কি সুন্দর হইল! কবি যে বারমাসের ফুল একেবারেই ফুটাইলেন! এক এক করিয়া ছয়টি ঋতু যদি একস্থানে মিলাইতে পারি, না জানি, সে কি মধুর শোভাই হয়! যক্ষ ত উন্মত্ত, কিন্তু দেখিতেছি, কবিও সেই সঙ্গে ক্ষেপিয়াছেন!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন, হইয়াছে কি?"

গৃহিণী। এই ধর না কেন, পদ্ম শরৎকালের মুখ চাহিয়া আছে,—কবে শরৎ আসিবে, তবে পদ্ম ফুটিবে; কুন্দকুসুমও তাই, হেমন্ত আসিয়া কুন্দকে ফুটাইয়া তুলে; শীত না আসিলে লোধ্র-কুসুম ফুটিবে না; বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ু না বহিলে কুরুবক ফুটিতে চাহে না; গ্রীষ্মের দিনেই শিরীষ-ফুল ফুটিয়া উঠে;—আর এমন মধুর বর্ষার দিনেই, ঐ দেখ না, কদম্বে গাছ ভরিয়া গিয়াছে!—ফুলভরে শাখা অবনত, গন্ধে আমাদের এ কুটীর আমোদিত। তা', এই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সব এক করিতে না পারিলে ত আর একেবারেই এত ফুল পাওয়া যায় না! কবি-কল্পনা ধন্য যে, এমন অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে আসিয়া থাকে।”

আমি। অসম্ভব কি? দেখ, যে কালের যে ফুল, তাহা সেই কালেই সুন্দর। কমল সুন্দর, কিন্তু হেমন্তের এতটুকু শিশিরস্পর্শে তাহা মলিন হইয়া যায়; অথচ সেই হেমন্তেই আবার কুন্দ-

কুসুম ফুটিয়া উঠে। এক যায়, আর হয়। কিন্তু দুই জনকে পাশাঁপাশি রাখিয়া দেখিতে কি সুন্দর! যখন লক্ষ্মী পূর্ণিমার ফুটন্ত আলোটুকু একটু একটু করিয়া, মলিন হইতে-না-হইতে, তাহার উপর নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ আলোকটুকু আসিয়া মিশে,— কি সুন্দর বল দেখি! প্রকৃতি নিত্য নূতন চাহে;— নয়ন ভরিয়া কিছুই দেখা হয় না। প্রেমময়ি, তোমার করকমলে ফুটন্ত কমল দুটী তুলিয়া দিয়া, অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে-না-দেখিতে দেখি, হেমন্তের শিশিরকণা পড়িয়া কমলের কোমল হৃদয় টুকু বিনষ্ট করিয়াছে! তখন দুঃখ হয়, হায়! এই করকমলে সে পরিপূর্ণ কুসুমযুগল থাকিতে থাকিতে, যদি এই কেশপাশে দুইটি কুরুবক, কর্ণে দুইটি শিরীষ, সীমন্তে দুইটা কদম্ব তুলিয়া দিতে পারিতাম,—তবে কি মধুর শোভায় এ স্বর্ণ-প্রতিমা খানি উজ্জ্বল দেখিতাম! কবিই কেবল মুহূর্ত্তের জন্য সে দুঃখ নিবারণ করেন। তিনি

সব এক করিয়া দেখাইয়া বলিতে থাকেন,—'দেখ, —নয়ন ভরিয়া দেখ!'—অপিচ, বিধাতার সৃষ্টি হইতে কবির সৃষ্টি কিছু স্বতন্ত্র মনে করিও না। তোমার আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া, কবি কল্পনার রথে চড়িয়া, চন্দ্রালোক হইতে অমর-প্রার্থিত সুধা আহরণ করেন।

গৃহিণী। তাহা মানিলাম; কিন্তু কবি ত নিজে কৌশল করিয়া ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারিতেন?

আমি। তাহা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, অলকায় প্রতিপাদপে নিত্য পুষ্প ফুটে, কোন ফুল কোন ঋতুবিশেষের মুখ চাহিয়া থাকে না। ইহাও মানিয়া লইতে পার।

গৃহিণী। তাহাও যেন হইল। কিন্তু এমন ফুলে ফুলে সাজাইলে বস্তুতঃ কি ভাল দেখিতে হয়? অলকার রূপসীরা, না জানি, এমন ফুলসাজে সাজিয়া আপনাদিগকে কত সুন্দরী দেখেন।

আমি। যে সাজে, সে ত কখন আপনার সাজান রূপ দেখে নাই? সাজিয়া নিজে সুখী হইয়াছে,—ভাবিয়াছে, তাহার দর্শকও সে রূপ দেখিয়া সুখী হইবে, সেই চিন্তাই তাহার সুখ। তাই রূপসী মনের মত সাজিয়াও দশবার করিয়া দর্পণ ধরিয়া দেখিতে থাকে,—বুঝি মনে হয়, তবুও হইল না, যেন কোথায় কি বাকী রহিয়া গেল, যেন ফুল্লকপোলে গোলাপের আভাটুকু ফুটিয়াও ফুটে নাই! কিন্তু তাহাই কি হয়?—নিজে কি দেখা যায়? যে রূপে তুমি আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর আলো করিয়া আছ, সে রূপ কি তুমি ঐ দর্পণে দেখিতে পাইবে? তাহা আমার অন্তরে। আমি তোমায় দেখিয়া, তোমার রূপ, অন্তরে দেখি। যে রূপ দেখিয়া এ হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—এক মুখে বলিয়া উঠিতে পারি না,—সে রূপ কেমন! কিন্তু তুমি তাহা দেখিতে পাইবে না। আবার আমি যেমন

করিয়া, যে সোনার চক্ষে তোমায় দেখিব, সে চক্ষু আর কেহ না পাইলে, তেমন করিয়া তোমায় দেখিতে পাইবে না। তাই যক্ষের রূপের সৃষ্টি—ঐরূপ। সে মনে মনে ঐরূপ সাজাইয়াই সুখী।

যক্ষ বলিতেছে,—

—ভাই মেঘ! তুমি অলকায় দেখিবে, প্রতি পাদপে নিত্যই পুষ্প ফুটিয়া থাকে, মধুমত্ত ভ্রমর-কুল গুঞ্জরিতে থাকে; প্রতিদিনই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, হংসশ্রেণী পদ্ম বেষ্টন করিয়া থাকে; গৃহ-পালিত ময়ূর সকল নিত্য 'পেখম' ধরিয়া থাকে, কেকাধ্বনি করিতে তাহারা সদাই মত্ত; তথায় প্রতি রাত্রিই মধুর জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত,—অন্ধকার না থাকিয়া অতি রমণীয়!

—সেখানে কেবল আনন্দের অশ্রু ঝরিয়া থাকে, দুঃখ কি শোকের অশ্রু সেখানে নাই।

মদন-সন্তাপ ভিন্ন অন্য সন্তাপ সেখানে নাই,—আবার প্রিয়জন-সমাগমে সে সন্তাপেরও প্রতিকার হয়! সেখানে প্রণয়-কলহ লইয়াই যা' বিরহ, অন্য বিরহ নাই! সেখানে যৌবন ভিন্ন বার্দ্ধক্য নাই! অলকায় কেবলই নৃত্য, গীত, পান ও ভোজনের উৎসব। সেখানে বিম্বাধরা, মুগ্ধা যুবতী প্রিয়তমের প্রেম-বিহ্বল আঁখি হইতে আপনার সৌন্দর্য্য লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে,—আর সরমে কুঞ্চিতা হইয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে!

—তুমি দেখিবে, অলকায় মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর উভয় তটে মন্দার বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। মন্দার ছায়ায় বসিয়া, মন্দাকিনীর কনক সৈকতে অমরপ্রার্থিতা যক্ষকুমারীরা 'গুপ্তমণি' খেলিতেছে, মন্দাকিনীর তরঙ্গ-সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া, তাহাদের সুকুমার দেহ জুড়াইতেছে।

—অলকায় প্রভাতে দেখিতে পাইবে যে, কুন্তলভ্রষ্ট মন্দারকুসুম, কর্ণচ্যুত কনককমল, শিরঃ-পতিত মুক্তাজাল, ও স্তনাভরণ হার পড়িয়া আছে। তাহাতে বুঝিতে পারিবে, গত নিশীথে অভিসারিণী কামিনীরা সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাই মেঘ! অলকায় এই সকল দেখিবে, কিন্তু সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুরের ফুলবাণ সেখানে দেখিতে পাইবে না। মহাদেবের ভয়ে সে দেশে তাঁহার ঠাঁই নাই!

গৃহিণী। কেন?

আমি। ভুলিয়া গেলে? এই যে...... শুনাইলাম—

> ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
> তাবত স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥

গৃহিণী। মনে পড়িতেছে বটে। হিমাদ্রি-শিখরে তপস্যা-নিরত মহাদেবের ক্রোধবহ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হন। পুনর্জীবন পাইয়া, ভয়ে

তিনি আর মহাদেবের কাছে আসিতে পারেন না। তা যদি অলকায় আসিতে তাঁহার এত ভয়, তবে সেখানে মদনসন্তাপে নরনারী সন্তপ্ত হন কেন ?

আমি। ইহাই আর বুঝিলে না ?

স ভ্রূভঙ্গ প্রহিত নয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ
স্তস্যারম্ভশ্চচতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ।

মদনের যে কাজ, তাহা চতুরা রমণীর অমোঘ ভ্রূভঙ্গেই সম্পন্ন হইয়া থাকে! মদনের ফুলশরও কখন কখন যাহা পারে না, চঞ্চলনয়নার ভ্রূভঙ্গ-বিলাসে তাহাও হইয়া থাকে! এখন বুঝিলে কি?

এখন একবার অলকার কথা ভাবিয়া দেখ,—এমন দেশ কি আর আছে? প্রতি রাত্রি জ্যোৎস্না-ময়ী, প্রতিপাদপে প্রতিদিন পুষ্প,—প্রতিপুষ্পে মধুকর ঝঙ্কার করে, পাখী গান গায়। শোক নাই, দুঃখ নাই, মনস্তাপ নাই,—আছে কেবল আনন্দের অশ্রু, প্রণয়ের কলহ,—মদনের সন্তাপ,

নরনারীর চির-যৌবন! মন্দাকিনী তীরে মন্দার-ছায়াতলে, যক্ষকুমারীরা 'গুপ্তমণি' খেলিতেছে; সৌধ-বাতায়নে বিরহিণী প্রিয়তমের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে; গৃহমধ্যে রত্নপ্রদীপ-সম্মুখে প্রেমিক তাঁহার মুগ্ধা প্রণয়িনীর রূপরাশি দেখিতে ব্যাকুল হইতেছেন; কিন্তু সরলা সরমে কুঞ্চিতা হইয়া, পুষ্পিতা নবলতিকার ন্যায় অবনতা হইয়া পড়িতেছেন। নিশীথে অভিসারিণী অভিসারে চলিয়াছে,—তাহাদের কুন্তলে মন্দার-কুসুম, সীমন্তে কদম্ব, কর্ণে কনককমল, বক্ষে সুবর্ণ-হার! গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—সারাটা দেশ উৎসবময়। এমন দেশ কি দেখিয়াছ? এ দেশ কেবল কবি-কল্পনার মধ্যে অবস্থিত! এমন মনো-হারিণী কল্পনার সৃষ্টি আর কোথায়? এই দেশ যক্ষের! সেই যে রামগিরি আশ্রম হইতে,অলকার পানে চাহিতে চাহিতে আসিতেছিলাম—এই সেই অলকা! সেই রামগিরি-আশ্রমে, যক্ষের পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া অলকার সৌন্দর্য্য দূরাগত আলোক-রশ্মির মত অতি অস্পষ্ট দেখিতেছিলাম,—অস্পষ্টেও তাহা সুন্দর!—এখন অলকার এই পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইলাম!

গৃহিণী। কিন্তু আমি এই দেশের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। আমি একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহাই সৌন্দর্য্যের সার! মানবপ্রাণে যে সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা অতি বলবতী, তুমি কি বলিতে চাও, এই খানেই তাহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে? আরও এক কথা,—সৌন্দর্য্যের জ্ঞান এখানে থাকা কি সম্ভব? যাহাতে সৌন্দর্য্যের অভাব, তাহাকে না দেখিলে সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। সুখ কি, বুঝিতে হইলে, যেমন দুঃখের জ্ঞান অপরিহার্য্য রূপে স্বীকার করিতে হয়, সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে হইলেও তেমনি কুৎসিতের পানে চাহিতে হয়। অলকায় তাহা নাই। তারপর, নিতান্ত বিলাসপ্রিয় ও অকর্ম্মণ্য

জীবের সুখ ও সৌন্দর্য্যের ধারণা ঐরূপ হইতে পারে ; কবি সেই পথে না চলিয়া, উচ্চতর পথে চলিলেই ভাল করিতেন।

আমি। আমি না বলিয়া দিলেও তোমার বুঝিলে ভাল হইত যে, কবি কোন আদর্শ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন নাই। শ্রেষ্ঠ জীবের যে সুখ ও সৌন্দর্য্যের ধারণা, কবি তাহাও ভাবেন নাই। এ কথা কে না স্বীকার করিবে যে, দুঃখজ্ঞান ব্যতীত সুখের ধারণা অসম্ভব ? যে বলিতে পারে না, সে সুখী কি দুঃখী, এক হিসাবে সে সুখী বটে,—কারণ সুখদুঃখের কোন জ্ঞানই তাহার নাই। কিন্তু যে আপনাকে প্রকৃত সুখী বা দুঃখী বলিয়া জানে,—সুখ বা দুঃখের জ্ঞান তাহার বড়ই বেশী। পরন্তু এ কথাও ঠিক যে, দুঃখে, স্বভাবতঃ অন্তর্দৃষ্টি কিছু প্রখর হয়।—একটু তীক্ষ্ণ অনুভূতি স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। এই হিসাবে আমি বলিতে চাই,—"সুখ অজ্ঞ, দুঃখ

জ্ঞানী।” সৌন্দর্য্যবোধও সেইরূপ। সৌন্দর্য্য-সম্পদের মাঝে যে জন্মিয়াছে,—জীবনে কুৎসিৎ কিছুই যে দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না, সৌন্দর্য্য কি। কিন্তু আলোক ও আঁধার যাহাকে প্রতিনিয়ত দেখিতে হয়, সে আলোক ও আঁধার উভয়ের পার্থক্য পরিষ্কার বুঝিতে পারে। তার-পর, সৌন্দর্য্যবোধ দর্শকের মনের অবস্থার উপরও নির্ভর করে। যাহা সৌন্দর্য্যের সার,—যাহা পাইলেই মনে হয়, প্রাণ জুড়াইল, সাধ মিটিল, তাহা মানবের একান্ত সাধনার ধন; তাহাতে তৃপ্তিজনিত বিষাদ নাই,—অবসাদ নাই, তাহাতে পরম আনন্দলাভ হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের সাধক-কবি তখন উন্মুক্ত হৃদয়ে গায়িতে থাকেন,—

“তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই (ই) ভাল লাগে।

* * * *

"ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভ'রে দেখি অনিবার
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার

এমন করিয়া সৌন্দর্য্যের ধ্যান কি যক্ষের পক্ষে সম্ভব? যক্ষ কামাতুর, বিরহ-বিবশ, প্রিয়া-মিলন-আশায় একান্ত ব্যাকুল;—অলকার মত দেশে তাহার জন্ম,—সে কি সৌন্দর্য্যের অত্যুৎকৃষ্ট ধ্যান জানে, না তাহা ধারণা করিতে পারে? কোলাহলপূর্ণ সংসারের দূরে বসিয়া, অন্তরের ভিতর যে অন্তর, সেখানে তপোবন রচনা করিয়া, যে মহাযোগী সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্যের জ্ঞান কি যক্ষের হইতে পারে? যে কেবল প্রিয়ার আনন স্পর্শ-সুখ লাভের প্রত্যাশায়, সখীজনের-শুনিবার-মত-কথাও প্রিয়ার কাণে কাণে বলিতে

চাহিত, তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান কিরূপ হইতে পারে, বুঝিয়া দেখ। কবি "মেঘদূত" কাব্যে যক্ষের হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন, বৈ কোন আদর্শ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন নাই। এখন, অলকার সৌন্দর্য্য যক্ষের চক্ষে দেখিতে হইবে। যক্ষের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা অলকা ব্যতীত অন্ত কোথাও মিটিতে পারে না। যক্ষ যখন অলকায় প্রিয়তমার পার্শ্বে ছিল, তখন এমন করিয়া হয়ত সে অলকার সৌন্দর্য্য বুঝে নাই। এখন অভিশপ্ত হইয়া, প্রিয়াবিরহে যত ক্লেশ ভোগ করিতেছে, জীবনের যে টুকু সুখ, তাহার প্রতি-বিন্দু সে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছে। তখন কেবল আলস্যে যাহা উপেক্ষা করিয়াছে, আজি তাহাই কত মূল্যবান! এই বিরহের পূর্ব্বে কত বর্ষা আসিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের উপর এমন দৌরাত্ম্য করিয়া, তাহার অন্তরের অন্তরে এমন মিলন-পিপাসা উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই।

এখন সে অলকার সৌন্দর্য্য বুঝিতেছে, অলকায় থাকিয়া কিন্তু এ সৌন্দর্য্য বুঝে নাই !

গৃহিণী। তুমি যাহা বুঝাইলে, তাহা বুঝিলাম। কবি যথার্থই সর্ব্বত্র যক্ষচরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। আমরা একটা বড় ভুল করি যে, কবি যে পথে গিয়াছেন, সে পথ হইতে তাঁহাকে না দেখিয়া, সর্ব্বত্রই যে পথে চলা উচিত, তাহা লইয়া "আদর্শের" দাবী করি।

আমি। আমি এই কাব্যখানি তোমাকে শুনাইতে বসিয়াছি, ভাব পরিষ্কার করিবার জন্যই দু'এক স্থলে একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝিয়াছি; নহিলে সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে।

অলকা যেরূপ তাহা শুনিলে, এখন অলকায় যক্ষের ভবন কিরূপ, তাহা শুন।

যক্ষ বলিল, "ভাই মেঘ! তুমি অলকায়

কুবেরের গৃহ দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে উত্তরে আমার গৃহ। দূর হইতে দেখিতে পাইবে, ইন্দ্র-ধনুর মত তাহার তোরণ-দ্বার। সেখানে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া আছে, আমার প্রিয়তমার অতি যত্নের একটি মন্দার বৃক্ষের চারা আছে। সেখানে এক জলাশয় আছে, তাহার সোপান-গুলি মরকতে নির্ম্মিত; সেই জলাশয় কুমুদ-কহ্লারে পরিবৃত, হংসগণ আনন্দে সেখানে বিচরণ করিতেছে। সেই জলাশয়-তটে এক ক্রীড়া-শৈল আছে। ক্রীড়াশৈলে মাধবীমণ্ডপের নিকট কমনীয় বকুল ও চঞ্চল-পল্লব অশোকতরু আছে। অশোক যেমন রমণীর চরণস্পর্শে,—বকুলও তেমনি রমণীর অধর-সুধাপানে কুসুমিত হইয়া উঠে! ভাই মেঘ! আমিও সেই বকুল ও অশোকের মত আমার প্রিয়তমার চরণস্পর্শ ও অধর-সুধা-পানের জন্য একান্ত কাতর আছি।”

গৃহিণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

"একি, অশোক ও বকুল পর্য্যন্ত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি? কথাটা যাহা শুনিলাম,—সম্পূর্ণ নূতন।"

আমি। বস্তুতঃ আমিও এ কথার প্রকৃত উত্তর জানি না। কোন তরু রমণীর চরণ-স্পর্শে,—কোন তরু তাহার অধর সুধাপানে,—কেহ সে কমনীয় দেহ-আলিঙ্গনে,—কেহ নিশ্বাস-স্পর্শে,—কেহ মধুর বচন শ্রবণে,—কেহ সুললিত নৃত্যদর্শনে পুষ্পিত হইয়া উঠে।* কথার কোন বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, ইহা আদৌ কবি কল্পনা মাত্র। কল্পনা হউক, কবি তোমাদেরই গৌরব বাড়াইয়াছেন।

---

* স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্ব্বিকসতি বকুলঃ শীধু গণ্ডুষসেকাত্ পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্। মন্দারো নর্ম্মবাক্যাত্ং। পটু মৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাচ্চ্যুতোগীতান্নমেরু বিকসতি চ পুরোনর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ।

যক্ষ এইরূপে স্বীয় ভবনের পরিচয় দিয়া, বলিল,—"ভাই মেঘ! যাহা বলিলাম, এই গুলি মনে রাখিও, তাহা হইলে আমার বাড়ী চিনিতে আর কোন গোল হইবে না। আমার বিরহে, দেখিবে, গৃহখানিও ম্লান হইয়া আছে।—সূর্য্য অস্ত-গমন করিলে, কমলের কি আর শোভা থাকে?

"মেঘ! তুমি কিন্তু তোমার এই বৃহৎ শরীর লইয়া একেবারে আমার প্রিয়ার সম্মুখীন হইও না, তাহা হইলে সে ভীতা হইবে। ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করিয়া, সেই ক্রীড়া-শৈলে বসিয়া, আমার প্রিয়াকে দেখিও। তুমি দেখিবে—

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
> শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
> যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥
> তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
> দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
> গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেম্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
> জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।

—"তুমি দেখিবে, আমার প্রিয়তমা যুবতী, কিছু কৃশাঙ্গী; তাঁহার দাঁতগুলি শিখরবিশিষ্ট, অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বের মত রক্তবর্ণ; তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, আঁখি দুটী চকিত হরিণীর ন্যায়; নিতম্ব-ভারে তিনি মন্থরগামিনী, স্তনযুগলের মধুর আয়-তনে ঈষৎ অবনতা;—তাঁহাকে দেখিলে বুঝিবে, সেই যুবতী বুঝি বা বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি!

-"চক্রবাকী যেমন চক্রবাক বিহনে একাকিনী, আহা, প্রিয়াও আমার, তেমনি আমা বিহনে একা-কিনী আছেন। যতই দিন যাইতেছে, বিরহিণীর বিরহ-বেদনা ততই গাঢ় হইতেছে। সেই অল্প-ভাষিণী আমার দ্বিতীয় জীবন। ভাই মেঘ, তুমি দেখিলেই চিনিতে পারিবে, শিশির-মথিতা কম-লিনীর মত, প্রিয়া আমার আশায় কেবল বাঁচিয়া আছেন মাত্র,—পূর্ব্বের সে রূপ আর নাই!"

প্রিয়তমার কথা এইরূপে বলিতে বলিতে, যক্ষের মনে হইতে লাগিল, যেন সে সম্মুখেই

তাহাকে দেখিতেছে।—এই সুদীর্ঘ বিরহক্লেশে তাহার প্রিয়ার কি দশাই হইয়াছে !

—"আহা, কেঁদে কেঁদে প্রিয়ার আমার চক্ষু-দুটী ফুলিয়া উঠিয়াছে. উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অধরৌষ্ঠ মলিন ও শুষ্ক হইয়াছে, যত্নের অভাবে কুন্তলগুচ্ছ চোকে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, মলিন মুখখানি করতলে রাখিয়া তিনি চিন্তামগ্না ;—আহা, যেন মেঘে পূর্ণচন্দ্র ঢাকিয়া রাখিয়াছে !

—"ভাই মেঘ ! তুমি আমার ভবনে গিয়াই দেখিতে পাইবে, হয় প্রিয়তমা পূজার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন, না হয় বিরহক্লিষ্ট আমার ক্ষীণদেহ মনে মনে কল্পনা করিয়া. তিনি আমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেছেন।—না হয় পিঞ্জরের সারি-কাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"অয়ি রসিকে ! আমার স্বামীকে কি তোমার মনে পড়ে ? তিনি যে তোমায় বড় ভাল বাসিতেন।" না হয় দেখিতে পাইবে, মলিনবসনা প্রিয়া আমার, উরুদেশে

বীণা রাখিয়া গান গায়িবার জন্য উদ্যত হইতে-ছেন, অমনি নয়নজলে বীণার তন্ত্রীগুলি ভিজিয়া গেল, গানও তিনি ভুলিয়া গেলেন। দিবসে কোন-না-কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া, কোনও রকমে তিনি বিরহ দুঃখটা ভুলিয়া থাকেন, কিন্তু নিশীথে তাঁহার যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। তিনি বিরহশয়নে শয়ন করিয়া থাকেন।—যেন প্রভাত-গগনে, কলামাত্র-অবশিষ্ট ম্লান চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। আমি নিকটে থাকিলে, উভয়ে যে রাত্রি ক্ষণমাত্রের ন্যায় যাপন করিতাম, এখন তাহাই তাঁহার পক্ষে একান্ত সুদীর্ঘ হইয়া উঠি-য়াছে। বাতায়ন-পথ দিয়া চন্দ্রকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, প্রিয়তমা সে দিকে চাহিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফিরাইয়া লন। নিদ্রা ত আসেই না, তবে যদি আমার স্বপ্নসুখ লাভ হয়,—এই আশায় তিনি নিদ্রা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।—ভাই মেঘ! যাহা বলিতেছি, ইহা কল্পনামাত্র

মনে করিও না। তিনি যে আমায় কত ভাল বাসেন, তাহা আমি জানি। জানি বলিয়াই তাঁহার এইরূপ অবস্থা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সত্য মিথ্যা তুমি গিয়াই দেখিতে পাইবে।”

গৃহিণী। আমি এইখানে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যক্ষের এই বিরহ—কিরূপ? এমন দারুণ বিরহেও যে, প্রিয়ার মুখখানি এমন করিয়া মনে মনে কল্পনা করিতে পারে, তাহার আবার দুঃখ কি? অন্তরে অন্তরে যখন যোগ, মানসে মানসে যখন এমন মিলন, তখন বিরহের অবসর কোথায়? যখন কাছে কাছে থাকি, মনে হয়, আমাদের এই মিলনটা—বিরহের দিনেও যেন অন্তরে অন্তরে হয়!—কল্পনায় সে অনুভূতি কি অনির্ব্বচনীয় মধুর!

আমি। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যক্ষের দুঃখ খুব গভীর বটে, কিন্তু এই আকুল

উচ্ছ্বাসে তাহার সেই গভীর দুঃখের ভার কিছু লাঘব হইয়াছে। প্রিয়াবিরহে তাহার প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে, এবং তাহার এতদূর চিত্তবিকার ঘটিয়াছে যে, সে, মেঘকে পর্য্যন্ত দূত বানাইতে পারিয়াছে;—ইহাতে একটা বিষম চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে,—এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামপ্রপীড়িত ও অস্থির-চিত্ত বিরহীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিরহের মধ্যেও যে একটা উদার সুখ, মধুর স্মৃতি এবং সেই স্মৃতিজনিত একটা পবিত্র অনুভূতি আছে,—যক্ষের মত বিরহী, তাহা বুঝিতে পারে না। মিলনের প্রখর রৌদ্রে কিছুই ভাল করিয়া দেখা হয় না; মিলনের যে টুকু সুখ ও সুধা, তাহার আস্বাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না; জীবনের প্রতি পল কত মধুময়, তাহাও ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পাই না;—চক্ষের উপর কি একটা আবরণ

পড়ে,—কি একটা মদিরা-নেশা উন্মত্ত করিয়া রাখে, যেন কিছুই বুঝা হয় না !—কিন্তু বিরহ, সে নেশাটুকু কাটিয়া দেয়, বিরহেই সব বুঝিতে পারি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুখ অজ্ঞ, দুঃখ জ্ঞানী ; এখনও বলি, দুঃখেই বিরহের উৎপত্তি এবং তাহাতেই সুখ দুঃখের সম্যক্ জ্ঞান। মাঝখানে মিলন-সম্ভোগ রাখিয়া তাহার একদিকে লালসা, অন্যদিকে বিরহ রাখিয়া দাও,—দেখিবে, লালসা যাহার যত বেশী, মিলন-সম্ভোগে তাহার তেমনি প্রবৃত্তি,—আবার বিরহেও তাহার তেমনি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ! যক্ষের লালসা অতি প্রবলা, তাই মিলন-সম্ভোগের জন্য তাহার প্রাণ কাতর বিরহেও তাই তাহার এমন উন্মত্ততা।

প্রিয়তমে ! তোমার প্রতিকৃতি মানসপটে চিরসমুজ্জ্বল। ভুল হইতে পারে না। আজি কত বর্ষ ধরিয়া দেখিলাম, তবুও ত ঐ ক্ষুদ্র মুখমণ্ডল দেখিবার মত দেখা হইল না ? আজি

যাহা দেখি, কালি তাহা নূতন হয়। জীবনের এত খানি পথ আসিয়া কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, কিন্তু ঐ অপূর্ব্ব রহস্য পরিপূর্ণ, অনন্ত সৌন্দর্য্য-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না—পুরাতন হইবে না, চিরনূতন রহিয়া যাইবে।—যতদিন নূতন, ততদিন মনে হইবে—আজিও ত নূতন রহিয়াছে, কৈ এত দেখি, তবু ত দেখার সাধ মিটিল না,—নয়ন ও মনের পিপাসা ত মিটিল না। পিপাসা যে মিটে না, তাহাই সুখ, নহিলে তৃপ্তি হইলে সকল সুখই চলিয়া যাইত! সেই সুনীল আকাশ, সেই অনন্ত অকূল সমুদ্র, সেই গগনস্পর্শী উন্নত গিরি, সেই বেতস-কুঞ্জ-কুটীর;—সবই ত চির-নূতন রহিয়াছে; সেই কালো নিবিড় মেঘের কোলে শুভ্র বলাকার শ্রেণী, সেই বাসন্তী মারুত দোদুল্যমানা পুষ্পিতা নব-লতিকা, আমার এই নয়নানন্দ ক্ষুদ্র কুটীরের চারিদিকের এই প্রাণারাম শোভা-

রাশি,—ইহারা ত চির-নূতন রহিয়াছে!—পাখীর প্রভাতী কণ্ঠ আজিও ত মধুর লাগে; আজিও ত ঐ বিধুমুখে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকি; আজিও ত এই সোনার পৃথিবী-বুকে অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি অবলোকন করি,—কিছুই ত পুরাতন হয় নাই, কিছুই ত ভুলিতে পারি নাই?—যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত হইয়াছে, তাহা ভুলিবার সামগ্রী নহে। যতদিন কাছে কাছে থাকি, সুখের সমুদ্রে আত্মহারা হইয়া রহি,—দেখিব কি? দেখা হয় না, কেবল একটা সুমধুর অনুভূতি মর্ম্মে মর্ম্মে চির জাগরূক থাকে! বিরহের দিনে অন্তরের অন্তরে সেই সুমধুর অনুভূতি ভাল করিয়াই জাগিয়া উঠে। তখন প্রতি বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়।—আজি যাহা বুঝিতেছি না, সেই দিনে তাহা বুঝিব।

বুঝিব, কিন্তু তাহাতেই কি প্রাণ জুড়াইবে?

কেবল 'মুরতি স্রোতে' ভাসিয়াই কি সে সুখ পাইব? লালসা যে প্রবলা, কেবল ধ্যানে কি সে পিপাসা মিটিবে?—"যজ্ঞে স্বর্ণময়ী সীতা চলে, প্রেমে চলে না।"

তবু শ্যামরূপ তরুণ তমাল আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধার প্রাণ জুড়াইত। কিন্তু সে প্রেমের লক্ষ্য অতি উচ্চ। তেমন উন্মাদিনী লালসা না থাকিলে, সে প্রেমের পূর্ণ সম্ভোগ হয় না। সেই প্রেমের বিরহেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত প্রিয়তমের সুন্দর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ দেখি! আকাশে দেখি, সেই শ্যামরূপ; বৃক্ষ লতায়, তৃণগুল্মে সেই শ্যাম-রূপ; প্রকৃতির মধুর হাসিতে সেই বিনোদ হাসি; বসন্তের মৃদুসমীরণে সেই সুরভি নিশ্বাস; পাখী গান করে,—যমুনার জল নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়,—শুনি, যেন দূরে সেই বাঁশী বাজী-তেছে,—যমুনার জল কল কল ছল ছল করিয়া নাচিয়া উঠিতেছে! তখন ক্ষুদ্র বাহু দুখানিতে

শূন্য আলিঙ্গন করিয়া মনে করি, "জীবনসর্ব্বস্ব! আর কোথায় পলাইবে? এই যে বুকের ভিতর তোমায় ধরিয়াছি!"—এইরূপ বিরহানন্দ প্রকৃত অন্তরের যোগ,—ইহার মধ্যে বিকৃত বিরহ নাই।

কিন্তু যক্ষের অবস্থা তাহা নহে। বিরহে যে সে জগৎ তন্ময় দেখিবে,—এবং বিস্ময়ে, পুলকে, আবেগে আত্মহারা হইয়া থাকিবে, তাহা সম্ভবে না। সে প্রিয়ঙ্গুলতিকায় তাহার প্রিয়তমার অঙ্গ, চকিত হরিণীলোচনে তাহার দৃষ্টি,—পূর্ণচন্দ্রে তাহার মুখপ্রভা, শিখিগণের পুচ্ছভারে তাহার কেশকলাপ, এবং নদীতরঙ্গে তাহার ভ্রূবিলাস দেখিয়াও দুঃখ করে,—'হায়! বিধাতা এত সামগ্রীতে প্রিয়তমার সাদৃশ্য না দিয়া, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে তাহা দিলেন না কেন?' বুঝি, তাহা হইলে, তাহাকেই বুকে করিয়া সে জ্বালা জুড়াইতে পারিত!—যক্ষের এ দারুণ বিরহের কি তুলনা হয়?

পরন্তু বর্ষার প্রকোপটা কত, একবার ভাবিয়া দেখ। আট মাস কাটিয়া গিয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া যক্ষ শীর্ণ হইয়াছে;—তাহার কি চিত্ত বিকার,—হৃদয়ের কি আকুল উচ্ছ্বাস! পুরুষের পক্ষে এতটা উচ্ছ্বাস ভাল হয় নাই বলিতেছ, সে কথা মানি; কিন্তু কথা এই যে, স্ত্রীজাতির অপেক্ষা পুরুষের অন্তর্লীনতা কিছু কম। তোমরা যেমন করিয়া ভালবাসার সামগ্রীকে হৃদয়ের ভিতর রাখিয়া আপনার আয়ত্ত করিতে পার, পুরুষের তেমন সামর্থ্য নাই। তোমাদের হৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়, অনন্ত, অতলস্পর্শ। পুরুষ, বিরহে একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে,—অনেকটা গাম্ভীর্য্যহীন, চঞ্চল ও প্রগল্ভ হইয়া উঠে; কিন্তু স্ত্রীজাতি হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া, হৃদয়ময়ী হইয়া, কল্পনাবলে প্রিয়তমের মিলনসুখ অনুভব করিতে পারে। এই জন্যই তোমাদের সে পরিমাণে উদ্বেল নাই, উচ্ছ্বাস নাই এবং

হাহাকারও নাই। প্রণয়োপভোগে স্ত্রীপুরুষে এই পার্থক্য।

সে কথা যাক। এখন, বর্ষার এই সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি, চারিদিকের কি মধুর শোভা! আর তুমি—তুমি পরিপূর্ণ শতদল, এই সৌন্দর্য্যের মাঝে কি অপরূপ শোভায় শোভাময়ী হইয়া আছ!—ভুলিতে কি পারি? কিন্তু এখন ধ্যানে বসিতে পারি না, এখন তোমার এই হাস্যময়ী মূর্ত্তি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না,—আমি কত সুখী। কিন্তু তুমি চলিয়া যাও,—আমি দেখিব, এই পরিস্ফুট জ্যোৎস্নাধারা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে,—আকাশের ঐ মধুর নীলিমাটুকু তুমি লইয়া গিয়াছ, বৃক্ষবল্লরীর ঐ নয়নস্নিগ্ধ মধুর শ্যামলতা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, আর পুষ্পরাশির সুরভিরাশিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে

অন্তর্হিত হইয়াছে !—সব যাইবে;কেবল আজিকার দিনের এই সুমধুর স্মৃতিটুকু জাগিয়া থাকিবে। সেই দিনে বুঝিব, তুমি সব—তুমি সকল শোভার আধার !—কাহাকে প্রাণের কথা বলিব ? নির্জ্জন এ রামগিরি আশ্রমে আমার কে আছে ? কে আমার প্রাণের কাহিনী শুনিবে ? আমার মত হতভাগ্য কে আছে বল দেখি ? হায়,আমার চক্ষের জলটুকু মুছাইতেও কেহ নাই ? এমন নিদারুণ অভিশাপ কে কবে পাইয়াছে ? তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ভাসাইতে হইবে,—প্রাণের ভিতর কতশত তরঙ্গ উঠিবে ! হৃদয়ের সেই অবস্থাই,—মহাকবির সর্ব্বভেদিনী প্রতিভার লক্ষ্যস্থল। এই অপূর্ব্ব গাথা তাহারই নিদর্শন।

যক্ষের পত্নী কেমন, তাহা যক্ষ মেঘকে বলিয়া দি:..ছ। তারপর শুন।

যক্ষ বলিল,—"ভাই মেঘ ! তুমি গিয়া যদি

দেখ, প্রিয়া নিদ্রিতা আছেন, তবে তাঁহাকে জাগাইও না ; কত কষ্টে নিদ্রাকে পাইয়া, স্বপ্নে হয়ত তিনি আমার মিলন-সুখ অনুভব করিতে-ছেন, সে স্বপ্নটুকু যেন তাঁর ভাঙ্গিয়া না যায়। তিনি জাগিয়া উঠিলে, স্নিগ্ধ-মধুর বাক্যে বলিও, "অয়ি অবিধবে! আমি তোমার স্বামীর প্রিয় সুহৃৎ। তাঁহাকে রামগিরি আশ্রমে দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি তোমাকে যাহা বলিয়া দিয়া-ছেন, তাহাই বলিতে আমি আসিয়াছি।"—এই কথা বলিলে তিনি নিতান্ত আশ্বস্ত হৃদয়ে ও একান্ত উৎসুক চিত্তে তোমার কথা শুনিবেন। অশোক বনে হনুমানকে দেখিয়া সীতা দেবীর মনে যেমন আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, ভাই মেঘ! তোমায় দেখিয়া আমার প্রিয়াও তেমনি ভাব প্রাপ্ত হইবেন। তুমি তাঁহাকে বলিও,—'সুন্দরি! তোমার সহচর, বিয়োগ-দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া বাঁচিয়া আছেন মাত্র।

তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তোমার বিরহে তাঁহার দেহ নিতান্ত কৃশ, মন অতি সন্তপ্ত, অশ্রুভারে তিনি আচ্ছন্ন এবং উৎকণ্ঠায় আবিষ্ট ও চঞ্চল। যে কেবল প্রিয়ার অধর-সুধা পানাশায় সখীজনের-শুনিবার-মত-কথাও কাণে কাণে বলিতে চাহিত, আজি তাহার কি দশা ভাবিয়া দেখ! সে তোমার প্রণয়কুপিতা মূর্ত্তি ধাতুরাগ দ্বারা শিলাতলে চিত্রিত করিয়া, তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতে অভিলাষ করে,—কিন্তু হায়! অমনি অশ্রুরাশি বিনির্গত হইয়া তাহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়! আলেখ্যেও যে, সে তোমার মিলন-সুখ লাভ করিবে, বিধাতা তাহাতেও বিমুখ। হিমাচল-সম্পৃক্ত সমীরপ্রবাহ কুসুম-গন্ধে আমোদিত হইয়া বহিতে থাকে,—তাহার মনে হয়, বুঝি সে সমীরণ, তোমার কোমল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে,—তাই সে আশাভরে সেই সমীরণ আলিঙ্গন করিতে থাকে! বলিও, এমনই

অবস্থায় তোমার সহচরের দিন কাটিতেছে। লোকে যে বলে, বিরহে কিছুই মনে থাকে না, এবং পূর্ব্ব স্নেহের ব্যত্যয়ও ঘটে, সে কথা ভুল। কেন না, তৎকালে ভোগের অভাবপ্রযুক্ত স্নেহ-রাশি অভীষ্ট বস্তুতে অধিকতর সংলিপ্ত হইয়া যায়। তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, আর কিছুকাল পরেই এ দুঃখের অবসান হইবে। সুখ কি দুঃখ, কাহারও চিরস্থায়ী হয় না। চক্রের ন্যায় মানবের অবস্থা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজি বিরহ-দিনে যে সকল বাসনা তোমার অন্তরের অন্তরে জাগিতেছে, আগামী শরৎকালে নির্ম্মল চন্দ্রিকা-ধৌত মধুর রজনীতে তাহা পূর্ণ হইবে।—ভাই মেঘ! এই সকল কথা যেন মনে থাকে। এই সকল কথা বলিয়া প্রিয়াকে আমার সান্ত্বনা করিও, এবং প্রত্যুত্তরে তিনি কি বলিয়া দেন, তাহাও আমাকে বলিয়া যাইও, বলিয়া গিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও। আমাদের এই প্রথম বিরহ,—

এই বিরহে আমার পত্নীও শোকাচ্ছন্না হইয়াছেন। আমিও প্রভাতকালীন কুন্দকুসুমের ন্যায় নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়াছি। প্রিয়বন্ধু মেঘ! আমার এই কথাগুলি লইয়া অলকায় আমার প্রিয়ার কাছে যাও। তুমি যাইবে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিব না,—তুমি নিশ্চয়ই যাইবে, আমার বিশ্বাস। চাতক যখন পিপাসাকাতর হইয়া জল প্রার্থনা করে, তখন নিঃশব্দেই তুমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাক। সৎপুরুষগণ অভীষ্ট বিষয় সম্পন্ন করিয়াই প্রার্থনাকারীর আশা পূর্ণ করেন,—মুখে কোনরূপ কথাও বলেন না।

গৃহিণী। কবি কি চতুর!

আমি। কেন?

গৃহিণী। আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, মেঘ যাইবে কি না, যক্ষ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিল না? তাহা হইলে, মেঘ কি উত্তর দেয়, তাহাও শুনা যাইত এবং কবি যে নিতান্ত বাতিকগ্রস্ত

হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতাম। কিন্তু কবি সে পথ আর রাখিলেন না,—সুন্দর কৌশলে আপনার পথ পরিষ্কার করিলেন। যক্ষ যখন মেঘকে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তখন বুঝিয়াছিলাম, যক্ষ বিরহবিহ্বল, একান্ত জ্ঞানশূন্য; বুঝিয়াছিলাম যে, "কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু।" কিন্তু মেঘ যদি 'হাঁ' কি 'না' বলিয়া কিছু উত্তর দিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, আফিঙের নেশায় কমলাকান্ত যেমন কীটপতঙ্গেরও পর্য্যন্ত কথা বুঝিত, কবিও মেঘকে তেমনি কিছু নেশাখোর করিয়াছেন! যাহাহউক, মেঘকে যে নিরুত্তর করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি। এই যে বেশ সমালোচনা করিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি! তার পর শুন। যক্ষ বলিতেছে,—"ভাই মেঘ! প্রিয়াবিরহে আমার কি দশা হইয়াছে, তাহা তুমি সব শুনিলে। এখন

তুমি তোমার কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, বর্ষা-সহযোগে অধিকতর শোভা বিস্তার করিয়া, তুমি তোমার অভীষ্টদেশে বিচরণ কর। আরও আশীর্ব্বাদ করি, আমি প্রিয়াবিরহে যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তোমাকে যেন তেমন বিরহ কখন ভুগিতে না হয়,—বিদ্যুল্লতা যেন চিরদিন তোমার বক্ষে শোভা পায়!”

এই আশীর্ব্বাদের সহিত মেঘদূত সমাপ্ত হইল। ইহার বাড়া আর আশীর্ব্বাদ নাই;—প্রবাসী-বিরহী আর অধিক আশীর্ব্বাদ জানে না। বিরহে যাহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে, পৃথিবী শূন্য মনে হয়, তাহার নিকট চিরমিলনের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা সুখের আশীর্ব্বাদ আর কি আছে? এমনি আশীর্ব্বাদ তোমাকে আর একদিন শুনাইয়াছি। বনবাসিনী ‘ছায়াসীতা’ স্নেহবর্দ্ধিত করি-শাবককে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অবিউত্তোদাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ সোম্মাদংসণাএ হোদু *।"

"বাছাকে যেন কখনও স্ত্রীবিযুক্ত হইতে না হয়।" বিরহের কি তীব্র যন্ত্রণা, তাহা যে বুঝিয়াছে, তাহারই আশীর্ব্বাদ এইরূপ হইয়া থাকে। সীতার ন্যায় তেমন বিরহই বা আর কাহার হইয়াছে? আমি যখন মনে করি, মিলনের এই সুখ, এই আনন্দ, এই অনির্ব্বচনীয় মধুরতা এক দিন থাকিবে না ;—এই হাস্যময়ী বসুন্ধরা, চন্দ্রতারা সুশোভিনী জ্যোৎস্নাময়ী এই রজনী, ইহাও একদিন অন্তর্হিত হইবে,—তখনই মিলনের মধুরতা, সুখের মধুর অনুভূতি, আনন্দের অপার উচ্ছ্বাস অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। বিরহের আশঙ্কায়ও মিলনের এতই সুখ! কিন্তু বিরহে সুখের আরও অধিকতর স্পষ্ট অনুভূতি। তখন মনে হয়,—হায়! মিলনের দিনে কেন এমন বুঝি নাই? তখন অতি সামান্য বলিয়া যাহা উপেক্ষা করিয়াছি,

* উত্তরচরিত।—তৃতীয় অঙ্ক।

হায়, কে জানিত, তাহা এতই সুখের!—কে জানিত, তাহারই জন্য প্রাণ এমন কাতর হইবে! মধ্যে মধ্যে ভবিষ্যতের কথাও ভাবি এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আর এমন করিব না,—এই বিরহের অবসানে মধুর মিলনে আর কিছুই উপেক্ষা করিব না।—অতীতের কত শত আধ-কথা শুনিতে শুনিতে, বর্ত্তমানের মোহে—নূতন আনন্দে সব ভুলিয়া গিয়াছি। যে বলিতেছিল, সেও ভুলিয়া গেল; যে শুনিতেছিল, তাহারও ভুল হইল!—সে আধখানি কথার আর আধখানি শুনা হয় নাই। আজ তাহাই কত মধুর বোধ হইতেছে! সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিরহের যন্ত্রণাও কেমন বর্দ্ধিত হইতেছে! এই জন্য বলিয়াছি যে,—সুখ অজ্ঞ, দুঃখই জ্ঞানী। বিরহ এত কষ্টের হইয়াও এই জন্য এত আনন্দের; আর তাই এই বিরহ-গাথা এত কষ্টের হইয়াও এতই সুখের। কত বিরহী আকুলপ্রাণে

এই বিরহ-গাথা গান করে; কত প্রবাসী ঐ মেঘ-পানে চাহিয়া নীরব ভাষায় প্রাণের আশা ব্যক্ত করে! এমন মধুর বর্ষার দিনে, এমন মধুর বিরহ-গাথা কত মধুর লাগে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ,—ভাষায় তাহা কি বুঝাইব! আজি এই মধুর নিশীথে—চিরানন্দময়ী তুমি,—তোমার পার্শ্বে বসিয়া এই মধুর বিরহ-গাথা আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে,—

"দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে, কতটুকু সুখ পাবে
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।"

দেখিলাম, গৃহিণী মুখখানি নত করিয়া হাসিতেছেন। সে হাসি আমার অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত করিল। আমি সবই সুন্দর দেখিলাম! উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিলাম, "দেখ প্রিয়ে! কি মধুর জ্যোৎস্না রাত্রি! এমনই মধুর জ্যোৎস্না-রাত্রির কত কথাই আজ মনে আসিতেছে। এমনই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে ট্রয়দুর্গের প্রাচীরে উঠিয়া

গ্রীক-শিবির পানে চাহিয়া, প্রণয়িনী ক্রেসিদার জন্য ট্রইলাস কত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন! এমনই স্ফুট-চন্দ্রালোকে সমুদ্র-তটে দাঁড়াইয়া প্রেম-পাগলিনী সুন্দরী ডিডো হৃদয়সর্ব্বস্ব ইনিয়াসের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন! এমনই চন্দ্রমা-শালিনী মধুযামিনীতে বৃন্দাবন-নিকুঞ্জবনে মধুর রাসলীলায় শ্রীরাধার প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছিল! এমনই হাস্যপ্রদীপ্ত মধুর নিশীথে পুণ্ডরীকের দর্শন-আশায় অনিন্দ্য-সুন্দরী মহাশ্বেতা অচ্ছোদ সরোবর-তটে আশা-পূর্ণ হৃদয়ে ধাবিত হইয়াছিলেন! এমনই চন্দ্রকরোজ্জ্বল নির্ম্মল নিশীথে প্রেম-বিহ্বলা সাগরিকা এক হস্তে লতাপাশ কণ্ঠে দিয়া, অন্য হস্তে অশ্রুপূর্ণ আঁখি মুছিয়াছিলেন! এমনই মধুর জ্যোৎস্নালোকে প্রেমোন্মত্ত রোমিও শত্রুর প্রাসাদ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী জুলিয়েটের প্রণয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন! এমনই জ্যোৎস্নারাত্রে, চন্দ্রকরোজ্জ্বল গঙ্গাবক্ষ

আলোড়িত ও উন্মথিত করিয়া শৈবলিনী ও প্রতাপ সেই অগাধ জলে কি সুন্দর সাঁতার দিয়াছিলেন! আর এমনই নির্ম্মল নিশায়, উন্মুক্ত আকাশতলে, সেই অরণ্যবেষ্টিত নির্জ্জন আরাবলী পর্ব্বতের উপর, প্রণয়-প্রাণ অমর-যমুনার কি মনোমোহকর নিরাশ-সঙ্গীত!—সঙ্গীতে নিরাশ-প্রেমের কি অপূর্ব্ব ভাবাভিনয়!—প্রিয়তমে, এই জ্যোৎস্না-রাত্রির আরও কত কথাই মনে পড়ে। কিন্তু আমার মত আর কেহ কখন যদি এই ঘটনাগুলি বিবৃত করেন, তিনি ইহাও বলিবেন,—এমনই জ্যোৎস্নাময়ী নীরব নিশীথে, বিরহাশঙ্কায় কোন ভীরু প্রণয়ী, মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব বিরহ-গাথা শুনাইয়া, তাঁহার সরলা প্রণয়িনীকে এমনই মুগ্ধা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর পিত্রালয়ে যাইবার কথা মুখেও আনেন নাই!

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তিনি ইহাও বলিবেন যে, এমনই মধুর

জ্যোৎস্নারাত্রে সেই মুগ্ধা প্রণয়িনী তেমন যাদু-মন্ত্রপূর্ণ বিরহগাথা অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া ভবিষ্যতে পিত্রালয়ে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন !”

কিন্তু সে কথা কার্য্যে পরিণত হইবার আগেই, আমি দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিলাম।

আষাঢ়, ১৩০২।

সমাপ্ত।